বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

মার্চ ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

এ সংখ্যায় রয়েছে...

- স্বশরীরে মিরাজ
- বিভিন্ন শব্দে দুরূদ শরীফ ও দালাইলুল খাইরাত
- শবে বরাত : করণীয় ও বর্জনীয়
- স্বাধীনতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব
- এ পথ সূফীদের নয়
- সহীহ হাদীসের শ্লোগান : কিছু কথা
- পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ভোট
- আওরঙ্গজেবকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি
- পরিবারে নারীর ভূমিকা

নিয়মিত

জীবন জিজ্ঞাসা ◆
একনজরে গত মাস ◆
জানার আছে অনেক কিছু ◆
ক্যারিয়ার ◆
বিজ্ঞান ◆
আবাবীল ফৌজ ◆
কবিতা ◆
চিঠিপত্র ◆

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

২৮তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা
মার্চ ২০২১ ♦ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭ ♦ রজব-শাবান ১৪৪২

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মদ উসমান গণি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা)
২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
ইসলামের মূল ভিত্তি/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৫

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৭

প্রবন্ধ
স্বশরীরে মিরাজ/মূল: শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)
অনুবাদ: মাওলানা মুমিনুল হক ০৯
বিভিন্ন শব্দে দুরূদ শরীফ ও দালাইলুল খাইরাত
মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ১২
প্রিয়নবী ﷺ এর মিরাজ/আহমদ হাসান চৌধুরী ১৪
শবে বরাত : করণীয় ও বর্জনীয়/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ১৭
স্বাধীনতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব/মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম ১৯
এ পথ সূফীদের নয়/মারজান আহমদ চৌধুরী ২১

উসূলে হাদীস
কোনো এক সনদে দুর্বল হলেই কি হাদীসকে দয়ীফ বলা যাবে?/জিয়াউল হক চৌধুরী ২৪
সহীহ হাদীসের শ্লোগান : কিছু কথা/মোস্তফা মনজুর ২৭

আন্তর্জাতিক
পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ভোট আব্বাস সিদ্দিকী ও 'বাংলাদেশি' প্রসঙ্গ/রহমান মোখলেস ৩৫

ইতিহাস-ঐতিহ্য
আওরঙ্গজেবকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি/ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক ৩৯

সফরনামা
উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে/মারজান আহমদ চৌধুরী ৪০

গ্রন্থ পরিচিতি
দালাইলুল খাইরাত/মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ৪৩

খাতুন
পরিবারে নারীর ভূমিকা/সৈয়দা রাজিয়া সুলতানা ৪৪

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৬
একনজরে গতমাস ৫১
জানার আছে অনেক কিছু ৫৩
বিজ্ঞান ৫৪
ক্যারিয়ার ৫৫
কবিতা ৫৬
আবাবীল ফৌজ ৫৮
চিঠিপত্র ৬৪
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

রজব মাস সমাগত। রাসূলে পাক ﷺ রজব ও শাবান মাসে আল্লাহর নিকট দুআ করতেন- 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসের বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।' প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, এ মাসেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহাবিস্ময়কর মিরাজ সংগঠিত হয়েছিল। ইসরা এবং মিরাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি নবী কারীম ﷺ এর একটি বড় মুজিযা এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ নিআমত। স্বল্প সময়ে স্বশরীরে সাত আসমান, জান্নাত, জাহান্নাম পরিদর্শনপূর্বক প্রিয় নবী ﷺ এর এ ভ্রমণ সৃষ্টিজগতের অন্যতম সেরা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ অলৌকিক ঘটনায় মুসলিম উম্মাহর জন্য রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। অন্যদিকে মিরাজের ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক।

...

হিজরী বর্ষের অষ্টম মাস শাবান। নানা দিক বিবেচনায় এ মাস অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূলে পাক ﷺ এ মাসকে তার নিজের মাস বলে উল্লেখ করেছেন। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের অনন্য সওগাত মাহে রামাদানের প্রস্তুতি পর্ব এ মাসেই শুরু হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) শাবান মাসের চাঁদ দেখে বেশি বেশি করে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন, নিজেদের সম্পদ হতে যাকাতের মাল পৃথক করে রাখতেন। যাতে গরীব ও মিসকীন উপকৃত হতে পারে এবং রামাদানের রোযা রাখার জন্য যেন তা ওসীলা হয়ে থাকে।

মাহে রামাদানের প্রস্তুতি ছাড়াও শাবান মাসের অনন্য মর্যাদার প্রধান দিক হলো, এ মাসে এমন একটি রজনী মহিমান্বিত রয়েছে। লাইলাতুল বারাআত বা শবে বরাত নামে এ রজনী সুপরিচিত। হাদীসে নববীতে এ রজনী 'লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান' বা শাবানের মধ্য রজনী হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এ রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি রহমত, বরকত ও ক্ষমা অবতীর্ণ হয়, নেকীর দরজা খুলে দেওয়া হয়, বান্দার দুআ কবূল করা হয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী এ রাতে মানুষের জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা হয়, ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয়, রিযক অবতীর্ণ হয়।

মহিমান্বিত শবে বরাতে আমাদের দুআ আল্লাহ আমাদের প্রতি বিশেষত মুসলিম উম্মাহর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। মৃত্যু পর্যন্ত এমন সব গুনাহ থেকে হিফাযত করুন যা তাঁর রহমত লাভে বাধা সৃষ্টি করে। মুসলিম উম্মাহ, আমাদের দেশ ও জাতি শবে বরাতে অফুরান কল্যাণ লাভে ধন্য হোক। আমীন।

স্বাধীনতার মাস মার্চ। ১৯৭১ সালের এ মাসে শুরু হয়েছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের এ যুদ্ধে। বাংলার অকুতোভয় সৈনিকেরা পরাজিত করে পাকিস্তানী হানাদারদের। এতো অল্প সময়ে একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র বিশ্বের বুকে আঁকা সত্যিই ছিল এক কঠিন ও দুরূহ কাজ। এ যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের এক অসম যুদ্ধ। একদিকে পাকিস্তানী সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী অপরদিকে একেবারে নিরস্ত্র বাঙালি। যারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাতৃভূমির স্বাধীকারের লড়াইয়ে। সকল পেশার সর্বস্তরের জনতা যোগ দিয়েছিল এ যুদ্ধে।

একটি দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়াই শেষ কথা নয় বরং একে সমৃদ্ধশালী করে তোলার মধ্যেই রয়েছে সার্থকতা। যে দিন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে হাসি ফুটবে সেদিনই আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সার্থক হবে। তাই আমাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

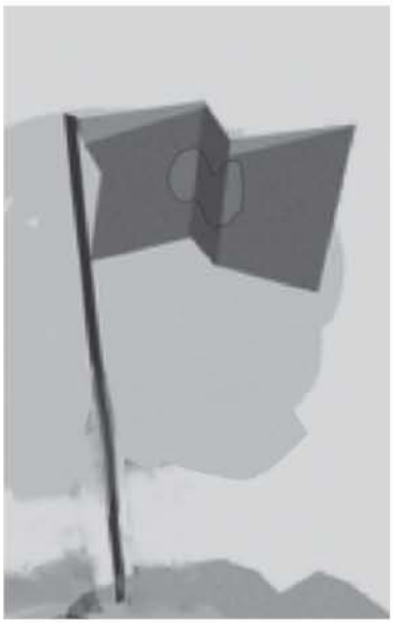

আত্-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ–

-আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ব্যাখ্যা: আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী, مفعول কে আগে আনলে বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আমরা আপনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না। ইবাদতের উপযুক্ত ঐ সত্তা হতে পারেন, যার থেকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের আশা করা যায়। তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারিত। এর কারণ হলো, বান্দাহ'র তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন- ১. অতীত ২. বর্তমান ৩. ভবিষ্যৎ। অতীতে বান্দাহ'র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাকে আবিষ্কার করলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا অর্থাৎ "আমি তোমাকে আগে সৃষ্টি করেছি। তখন তুমি কিছুই ছিলে না" [১] এরপর তাকে শ্রবণের, দর্শনের এবং উপলব্ধি করার শক্তি দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ 'তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন।'[২] বর্তমানকালে বান্দাহর অনেক প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা রয়েছে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বান্দাহর গোনাহ আর অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ রব, রাহমান ও রাহীম। আর ভবিষ্যৎ তথা মৃত্যুর পর বান্দাহের সমস্ত কাজের সম্পর্ক তার মালিকের সাথে, কারণ তিনি শেষ বিচারের দিনের মালিক। আর সকল অবস্থায় বান্দাহ তার রবের নিকটই প্রার্থনা করে। এ জন্যই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্যিকার মা'বুদ নেই। তিনি চিরন্তন অমুখাপেক্ষী। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। এটা নিয়ম যে, নিজের চাহিদা পূরণের জন্য খিদমাতের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনিই ইবাদতের অধিকারী। এজন্য আল্লাহ বলেন, وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ 'তোমার রব নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।'[৩]

اياك আগে ব্যবহারে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়, যাতে ইবাদত এদিক সেদিক না হয়। শয়তান যখন মানুষের অন্তরে আলস্য ও বাতিল খেয়ালের সঞ্চার করে, তখন **اياك نعبد** বললে সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার জালালতের প্রভাব অন্তরকে প্রভাবিত করে। তখন অন্তর দাসত্বের হক আদায় করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। শয়তান ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে যে, মা'বুদ কে? শয়তানের এ ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাকার উত্তম পদ্ধতি হলো এই **اياك نعبد**। এছাড়া এটাও একটা বাস্তব সত্য যে, যে সত্তা সকলের উর্ধ্বে এবং আগে, তাঁকে সর্বদা সকলের আগে উল্লেখ করাই উচিত। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতের জন্য এটা ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি। কারণ আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলেন, اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ তোমরা আমার নিআমতের কথা স্মরণ কর। তাদেরকে নিআমতের স্মরণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আর উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। এটাই হচ্ছে এ আয়াতের বৈশিষ্ট্য।

نعبد শব্দের মধ্যে বহুবচন ব্যবহারের হিকমত

এখানে **نعبد** বহুবচন ব্যবহার করায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বান্দাহকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এখানে এমন শব্দ ব্যবহার হয়েছে যাতে সম্মান এবং মর্যাদা রয়েছে। আর এটা আল্লাহ তাআলার নিয়ম। যেমন আল্লাহ বহুবচনের সিগাহ ব্যবহার করে বলেন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি।'[৪]

আল্লাহ তাআলা যেন বলছেন, হে বান্দাহ! যখন তুমি আমার দাসত্ব প্রকাশ করেছ এবং আমার গোলাম হওয়াকে অস্বীকার করনি, আমি তোমাকে একটি উম্মত বানিয়ে দিয়েছি, যেভাবে ইবরাহীমকে বানিয়েছি। اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً –অবশ্যই হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি উম্মত ছিলেন।[৫]

দ্বিতীয়ত: যদি **اياك اعبد** বলা হতো, তা আবদ হওয়ার দাবি রাখত। আর اِيَّاكَ نَعْبُدُ বলা হলে তার অর্থ হবে, আমি আপনার গোলামদের মধ্য হতে একজন গোলাম; আর নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বেশি আদব ও বিনয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে, জামাআতের সাথে নামায আদায় করা উত্তম। এর মধ্যে আরও ইশারা রয়েছে যে, আমি আপনারই ইবাদত করছি, ফিরিশতারা আমার সাথে আছেন, এমনকি উপস্থিত সবাই এবং আল্লাহ তাআলার নেককার বান্দাহগণও আছেন।

বর্ণিত আছে, জনৈক গ্রাম্য লোক মসজিদের দরজায় এসে নিজের উট থেকে নেমে পড়লেন এবং উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ করলেন। অত্যন্ত প্রশান্তি ও ভক্তি সহকারে নামায আদায় করলেন ও দুআ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তারপর যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন নিজের উট পেলেন না। উট না পেয়ে তিনি বললেন, আল্লাহ! আমি আপনার আমানত আদায় করেছি, আমার আমানত কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন, আমি এতে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার নিকট এরকম বলার পরপরই বিলম্ব না করে একটি লোক উটের উপর আরোহণ করে চলে আসল, আরো দেখলাম তার হাত কেটে দেওয়া হয়েছে। সে উটটি তাকে

সোপর্দ করে চলে গেল। [৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে আব্বাস (রা.) কে বলেন, হে বৎস! একাকী অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ পালন কর, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। এজন্য বলা হয়, ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে অকল্যাণ হতে আনন্দের জগতে পদার্পণ করা। [৭]

মোটকথা, نعبد শব্দ দ্বারা আল্লাহর প্রেম সাগরে এমন ইখলাস সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা বান্দাহ অন্তরের মধ্যে আনন্দ, স্বাদ, নৈকট্য অনুভব করে। যার দ্বারা বান্দাহ নামাযের বাইরের সকল বস্তু হতে বেখবর হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان حين يشرع في الصلوة كانوا يسمعون من صدره ازيزا كازيز المرجل রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তাঁর বক্ষ মুবারক থেকে শ্রুতিমধুর সুর অনুরণিত হতো। [৮] এটা মোটেই দুরূহ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলার বাণী فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ "অতঃপর যখন তারা তাকে দেখল তখন তারা তার মহিমায় আভিভূত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল।" [৯]

এখানে মানুষের সৌন্দর্য দর্শনে যদি এমন প্রভাব পড়তে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য-মর্যাদা অন্তরে উপলব্ধি করে বান্দাহর মনেও অনুরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া একজন বাদশাহের সামনে যদি তার প্রজা দাঁড়াতে ভয় পায়, তাহলে রাব্বুল আলামীনের সামনে বান্দাহ'র কী অবস্থা হতে পারে, তা তো সহজেই বুঝা যায়।

আবিদ তিন স্তরে ইবাদত করেন। এর মধ্যে একদল সাওয়াবের আশায় প্রেরণা পায় আবার শাস্তির ভয়ে ইবাদত করার জন্য উদ্যত হয়। এ ধরনের লোককে 'যাহিদ' বলা হয়। যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য ইবাদত করে তাকে 'আরিফ' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে মালিক এবং নিজেকে আল্লাহ তাআলার গোলাম মনে করে। মালিকের সম্মানার্থে মালিককে ভয় করে এবং তার দাসত্বের জন্য নিজেকে বিনয়ী ও হীন মনে করে। এমন চিন্তা-ধারা নিয়ে যে যা-ই করবে তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে; আর ইবাদতের অন্তিম স্তর হচ্ছে ঐটাই। যার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে إِيَّاكَ نَعْبُدُ (অর্থাৎ আমরা আপনারই ইবাদত করি) এর মাধ্যমে।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাইলের এক আবিদ সত্তর বছর পর্যন্ত একাকী ইবাদত করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফিরিশতা পাঠিয়ে বলেন, হে আবিদ! তুমি কষ্ট কর না। কারণ তোমার ইবাদত কবুল হচ্ছে না। আবিদ জবাব দিলেন, এটা আমার দায়িত্ব। আমি গোলামী করতেই থাকব। আর কবুল করা না করা এটা মাবুদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে। যখন ফিরিশতা ফিরে গেলেন, তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, আমার বান্দাহ কী জবাব দিয়েছে? ফিরিশতা বলেন, হে রব! আপনি তো জানেন, সে এরকম এরকম বলেছে। এতে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাকে বলেন, তুমি আবার গিয়ে বল। হে আবিদ! তোমার নিয়তের দৃঢ়তার কারণে তোমার ইবাদত কবুল করা হয়েছে।

আল্লাহর দাসত্বের মর্যাদা লাভ করাই একজন মানুষের চূড়ান্ত মর্যাদা। এজন্য আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসা করে বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا- ঐ মহান আল্লাহ তাআলা অতিশয় পবিত্র যিনি তার বান্দাহকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন। [১০]

হযরত ঈসা (আ.) এই বলে গৌরব করেছেন, اني عبد الله আমি আল্লাহর গোলাম। আর হযরত আলী (রা.) বলেন,

كفاني فخرا ان اكون لك عبدا * كفاني شرفا ان تكون لي ربا

-(হে আল্লাহ) আমার গৌরবের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমি আপনার গোলাম। আমার সম্মানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আপনি আমার রব।

কোনো কিছু করা বা না করার ক্ষেত্রে বান্দাহর ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। এতে একটা বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। এ প্রাধান্য আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তা উপলব্ধি করার মতো বিবেক বান্দাহর থাকা সত্ত্বেও সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া সত্যের অনুসন্ধান করার জন্য অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেওয়াও আল্লাহ তাআলার কাজ। এজন্য বলা হয়,

لا حول عن معصيت الله الا بعصمة الله ولا قوة علي طاعة الله الا بتوفيق الله

-আল্লাহ তাআলার পরিত্রাণ ছাড়া কেউ গোনাহ থেকে ফিরে থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলার তাওফীক ছাড়া তার অনুগত হয়ে চলার শক্তি কারো নেই।

সকল কাজের ফলাফল আল্লাহ তাআলার কুদরতী হাতের মুঠোয় রয়েছে, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হতে পারে কাজের শুরুতেই কী সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে? এর জবাবে বলা যায়, কাজের শুরুতেই যেন বান্দাহ বলছে, আল্লাহ! আমি ইবাদত শুরু করলাম, তুমি তা পূর্ণ করে দাও। আল্লাহ তোমার সাহায্য কামনা করি, যেন কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। কেননা قلوب المؤمنين بين اصبعين من اصابع الرحمٰن মুমিনদের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যখানে। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট সাহায্য চাইব না। তাঁর হাত পা বেঁধে আগুনে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তখন হযরত জিবরাইল (আ.) এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে? হযরত ইবরাহীম খলীল জবাব দিলেন, তোমার কাছে আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এতে জিবরাইল (আ.) বললেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাও। হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, حسبي من سؤالي علمه بحالي আমার চাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমার অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানেন। [১১]

এ থেকে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উদঘাটিত হয় যে, মুমিন নামাযে দাঁড়ালে হাঁটা-চলা থেকে পা বেঁধে নেওয়া হয়, হাত কোনো কিছু ধরা থেকে বেঁধে নেওয়া হয়, আর মুখকে কুরআন পাঠ এবং তাসবীহ ব্যতীত অন্যান্য সকল কথা বলা থেকে বন্ধ রাখা হয়। যেভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ "হে আগুন তুমি ইবরাহীমের উপর ঠান্ডা এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে যাও।" [১২]

এভাবে জাহান্নামের আগুন বলবে, جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي হে

মুমিন! তুমি তাড়াতাড়ি কর। কারণ তোমার নূর আমার অগ্নিশিখা নিভিয়ে দিচ্ছে। [১৩]

সম্বোধনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার মধ্যে উপকারিতা

প্রশ্ন হতে পারে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত সম্বোধন ছাড়া প্রশংসা করে اِيَّاكَ نَعْبُدُ থেকে সম্বোধনের দিকে প্রত্যাবর্তন করার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে? এর উত্তরে বলা যায় যেহেতু নামায শুরু করার সময় মুসল্লী অপরিচিত ছিল, কাজেই সম্বোধন ছাড়াই مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেছে। এরপর যেন আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বান্দাহ! তুমি আমার প্রশংসা করেছ এবং তুমি স্বীকার করেছ, আমি সমস্ত সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা, রহমান, রহীম, বিচার দিবসের মালিক। তাই সত্যিই তুমি আমার খুব ভালো বান্দাহ। তোমার জন্য আমি আমার পর্দাকে উঠিয়ে দিলাম। যে দূরত্ব ছিল তা নৈকট্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। তুমি সম্বোধন করে কথা বল এবং বল, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

যেহেতু اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। সেহেতু তা দূর করার জন্য সাথে সাথে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আনা হয়েছে।

১। সূরা মরিয়ম; আয়াত-৯, ২। সূরা আন নাহল; আয়াত-৭৮, ৩। বনী ইসরাইল; আয়াত-২৩, ৪। সূরা ইউসুফ; আয়াত-০৩, ৫। সূরা নহল; আয়াত-১২০, ৬। (তাফসীরু গারাইবিল কুরআন লিন নিশাপুরী, সূরা ফাতিহা)

৭। (তাফসীরে কাবীর; ইমাম রাযী, সূরা ফাতিহা, فصل– تفسير اياك نعبد واياك نستعين)

৮। (তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী, সূরা ফাতিহা) ৯। সূরা ইউসুফ-আয়াত ৩১, ১০। সূরা বনী ইসরাইল; আয়াত ১, ১১। তাফসীরে বাগভী; সূরা আম্বিয়া, ১২। সূরা আম্বিয়া; আয়াত-৬৯, ১৩। আল মুজামুল কাবীর লিত তাবারানী; হাদীস নং ১৮১৫৮০

ইসলামের মূল ভিত্তি

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

অনুবাদ

আবূ আবদির রাহমান আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনিল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: ১. একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, ২. নামায কায়িম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. বায়তুল্লাহ'র হজ্জ করা ও ৫. রামাদানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রাসঙ্গিক কথা ও বর্ণনাকারী পরিচিতি

এ হাদীস দ্বীন পরিচয়ের অন্যতম মূল ভিত্তি। কেননা এতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে। অবশ্য, হাদীসে জিবরাইলেও এ বিষয়গুলো রয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.)। তাঁর উপনাম আবূ আবদির রাহমান। তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) এর পুত্র। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) তাঁর সহোদর বোন। তাঁর মা হলেন যায়নাব বিনতে মাযউন (রা.)। তিনি হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) এর সহোদর ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আপন পিতার সাথে মক্কা শরীফে বাল্যকালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর পিতার সাথেই হিজরতও করেন। কারো কারো মতে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.), পিতার পূর্বেই মুসলমান হন এবং তাঁর পূর্বে হিজরতও করেন। তবে এ উক্তিটি বিশুদ্ধ নয়।

তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ সে সময় তাঁর বয়স কম ছিল। উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও বয়স পূর্ণ পনের বছর না হওয়ায় তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণে অধিক গুরুত্ব দিতেন। সবসময় প্রিয়নবী ﷺ এর পদাঙ্ক অনুসরণে সচেষ্ট থাকতেন।

তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম। এক্ষেত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর পরই তাঁর স্থান। তাঁর থেকে ২৬৩০টি হাদীস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ১৭০টি হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফে তাঁর ৮১টি হাদীস এমন আছে, যেগুলো মুসলিম শরীফে নেই। আর মুসলিম শরীফে তাঁর ৩১ টি হাদীস এমন আছে, যা বুখারীতে নেই।

একবার আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে তাগিদ দিয়েছিলেন যে, হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে ইবনু উমর (রা.) এর বিরোধিতা করো না। কথাটি হাজ্জাজের কাছে খারাপ মনে হলো। যখন আরাফাত থেকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, তখন হাজ্জাজের ইঙ্গিতে একব্যক্তি বিষাক্ত বল্লম তাঁর পায়ে লাগিয়ে দেয়। ফলে তিনি কয়েকদিন গুরুতর অসুস্থ থেকে যিলহজ্জ মাসে ৭৩ হিজরীতে শাহাদাত লাভ করেন। (নাসরুল বারী)

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসে ইসলামকে একটি তাবুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি তাবুতে সাধারণত পাঁচটি স্তম্ভ থাকে। চারদিকে চারটি এবং মধ্যখানে একটি। ঈমান মধ্যবর্তী মূল স্তম্ভতুল্য এবং বাকী চারটি অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত চারকোণার চারটি স্তম্ভতুল্য।

ইসলামের রুকন কেবল এ চারটিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং আরো রুকন আছে। আল্লামা আবুল আব্বাস কুরতুবী (র.) বলেন, এ পাঁচটি বিষয় হলো দ্বীনের মূল। এগুলোর দ্বারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ হাদীসে উক্ত পাঁচটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অথচ জিহাদ দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাতিলদের চক্রান্ত ধ্বংস করে। এর কারণ হলো, উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় সর্বদা ফরয। কিন্তু জিহাদ এরূপ নয়। এটি ফরযে কিফায়াহ এবং কখনো কখনো জিহাদ সাকিত হয়ে যায় (অর্থাৎ এর আবশ্যকতা থকে না)।

নিম্নে ইসলামের মূল ভিত্তিগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

ঈমানের সাক্ষ্য

ইসলামের মূল স্তম্ভ হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এখানে দুটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের কথা রয়েছে। ১. আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, ২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালতের প্রতি বিশ্বাস। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালতে বিশ্বাস ছাড়া কেবল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের দ্বারা ঈমান হয় না। সুতরাং কেউ কেবল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করলে তাকে মুমিন বলা যাবে না।

হাদীস শরীফে আছে, مَن قال لا اله الا الله دخل الجنة। যে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই সে জান্নাতে যাবে।

এ হাদীস থেকে মনে হতে পারে, তাওহীদ তথা কেবল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। বিষয়টি এমন নয়। এখানে বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কেবল لا اله الا الله।এর কথা বলা হয়েছে। এর সাথে মূলত পরবর্তী محمد رسول الله অংশও অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদে বিশ্বাসের সাথে রিসালাতে বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনিভাবে অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলোও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اٰمُرُكُم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلوة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم.

-আমি তোমাদের এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান, এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ কী? এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ হলো- একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়িম করা, যাকাত দেওয়া, রামাদানের রোযা রাখা এবং গনীমতের এক পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) দান করা।

নামায

নামায ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। এটি শারীরিক ইবাদত। ঈমানের পর পরই নামাযের স্থান। নামায ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নামায দ্বীনের স্তম্ভ। যে তা কায়িম করলো সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করলো। আর যে তা ছেড়ে দিলো সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো।

ইকামতে সালাত তথা নামায কায়িম করা'র অর্থ হলো, নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, যথাসময়ে ও যথাযথরূপে তা আদায় করা, সর্বোপরি নিবিষ্ট চিত্তে তা সম্পাদন করা। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

-তোমরা যত্নবান হও সকল নামাযের প্রতি এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান হও। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

ইকামতে সালাতের অর্থ নিয়ে উলামায়ে কিরামের আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে।

নামায কখন ফরয হয়?

জমহুর উলামার ঐকমত্যে নামায মি'রাজ রজনীতে ফরয হয়েছে। মি'রাজ হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর ও হিজরতের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। তবে কোন সালে ও কোন মাসে হয়েছে এ বিষয়ে অনেক ইখতেলাফ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, নবুওয়াতের দশম বর্ষে শিআবে আবি তালিব থেকে বের হওয়ার পর হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তিকাল হয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মি'রাজ নবুওয়াতের দশম বছরের পর একাদশ বর্ষে সংঘটিত হয়েছে। (সীরাতুল মুস্তাফা)

মি'রাজ কোন মাসে হয়েছে এ বিষয়ে পাঁচটি মত পাওয়া যায়। ১. রবিউল আউয়াল মাসে, ২. রবিউস সানী মাসে, ৩. রজব মাসে, ৪. রামাদান মাসে ৫. শা'বান মাসে। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো রজব মাসের ২৭ তম রাতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে। (সীরাতুল মুস্তাফা, শরহে মাওয়াহিব সূত্রে)

যাকাত

যাকাত আর্থিক ইবাদত। এটি আমভাবে সকল মুসলমানের উপর ফরয নয়। বরং সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সামর্থবান মুসলমানের উপর ফরয।

হজ্জ

হজ্জ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয়। এটিও আমভাবে সকলের উপর ফরয নয়। হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি। ১. মুসলমান হওয়া, ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৩. আকিল বা জ্ঞানবান হওয়া, ৪. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া, ৫. আযাদ বা স্বাধীন হওয়া ৬. দৈহিক ও আর্থিকভাবে হজ্জ পালনে সক্ষম হওয়া ৭. হজ্জের সময় হওয়া।

রামাদানের রোযা

রামাদানের রোযা সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরয। এটি শারীরিক ইবাদত। শরীয়তের পরিভাষায় সাওম বা রোযা হলো, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম। অন্যান্য ইবাদতে লৌকিকতার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু রোযার মধ্যে লোক দেখানোর সুযোগ কম থাকে। এজন্য হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রোযা আমার জন্য এবং আমি এর প্রতিদান দিব। অথবা আমিই এর প্রতিদান।

শেষ কথা:

ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে ঈমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি না থাকলে অপর চারটি কোনো কাজের নয়। কিন্তু যদি কারো ঈমান থাকে আর অপর কোনোটির ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি থাকে তবুও সে ব্যক্তি মুমিন বলে গণ্য হবে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হিজরতের রাতে হযরত আলী (রা.)

হিজরতের রাতে হযরত আলী (রা.) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বিছানায় শয়ন করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী রাসূল ﷺ এর বিছানায় শয়ন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে রাখা লোকদের আমানত ও রাসূল ﷺ এর কর্জ আদায় করে তারপর রাসূল ﷺ এর সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি আলীকে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) যথানির্দেশ কাজ করেন, অতঃপর হিজরত করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড)

হযরত আলী (রা.) এর হিজরত

রাসূল ﷺ এর হিজরতের পর হযরত আলী (রা.) তিনদিন মক্কায় অবস্থান করেন এবং মানুষের আমানতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে মদীনার পথে হিজরত করেন। হযরত আলীর কোনো বাহন ছিল না। তিনি পায়ে হেঁটে অতি কষ্টে হিজরত করেছিলেন। মরু কংকরময় পথ, দুর্গম পাথুরে পাহাড় অতিক্রম করে হযরত আলী (রা.) মদীনায় উপস্থিত হন। বাহন ছাড়া কারো পক্ষে অগ্নিঝরা তাপে দিবাভাগে পথ চলা বড়ই কঠিন ছিল। হযরত আলী (রা.) দিনে পথ চলা বন্ধ রাখতেন, রাত্রে পায়ে হেঁটে চলতেন। শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে প্রিয়নবীর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর পদদ্বয় ফুলে গিয়েছিল ও রক্ত ঝরছিল। আল্লাহর নবী হযরত আলী (রা.) এর দুরবস্থা দেখে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, কাঁদলেন। তারপর মুখ মুবারকে হাত দিয়ে হযরত আলীর জখমে থুথু লাগিয়ে দিলে আলী (রা.) সুস্থ হয়ে উঠলেন। রাসূল ﷺ এ সময় কুলসুম বিন হিদামের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)

বদর যুদ্ধের প্রারম্ভে কাফির দল থেকে উতবা বিন রবিআ, শায়বা বিন রবিআ ও ওলীদ বিন উতবা বের হয়ে উভয় কাতারের মাঝখানে এসে তাদের মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করল। রাসূল ﷺ এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.), হামযা (রা.) ও উবায়দা বিন হারিস (রা.) তাদের মুকাবিলার জন্য বের হলেন। তাঁরা তিনজন যথাক্রমে ওলীদ, শায়বা ও উতবার মুকাবিলা করলেন। কাফির দলের তিনজনই নিহত হলো। (প্রাগুক্ত)

হযরত আলী (রা.) ও হামযা (রা.) অক্ষত ফিরে আসলেও উবায়দা (রা.) গুরুতর আহত হলেন। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে 'সাফরা' নামক স্থানে উবায়দা (রা.) ইন্তিকাল করেন। উবায়দা বিন হারিস রাসূল ﷺ এর কদম মুবারকের উপর নিজের গাল রেখে ইন্তিকাল করেন। রাসূল ﷺ বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি নিশ্চয়ই শহীদ। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন, هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (এরা দুটি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে)। উল্লিখিত আয়াতে যে দুটি বিবদমান পক্ষের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে হযরত আলী, হামযা ও উবায়দা এক পক্ষ, যারা মুমিন। আর উতবা, শায়বা ও ওলীদ অন্য পক্ষ, যারা কাফির।

উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)

উহুদ যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) কাফিরদের বিরুদ্ধে অতিশয় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন ও বহু সংখ্যক কাফিরকে হত্যা করেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ কাফিরদের হাতে আহত হলে হযরত আলী তাঁর চেহারা মুবারক থেকে রক্ত ধুয়ে দেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৪)

উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আলী (রা.)। প্রথমে তাঁর হাতে ঝান্ডা ছিল। তারপর যায় মুসআব বিন উমাইর (রা.) এর হাতে। বাম বাহুর নেতৃত্বে মুনযির বিন আমর আনসারী ও মধ্যভাগের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত হামযা (রা.)। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড)

খন্দক যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)

খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ সালা পর্বতকে পিছনে রেখে সম্মুখভাগে মুসলিম সেনাদের জন্য প্রয়োজনীয় ময়দান রেখে এ ময়দানকে পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত করেন, এজন্য এই যুদ্ধকে খন্দক যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধে মক্কার কাফির দল ছাড়াও আরবের আরো অনেক কাফির দল অংশগ্রহণ করে। এজন্য এ যুদ্ধের আরেক নাম আহযাব। কাফির বাহিনীর সম্মিলিত সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। মুসলমান মাত্র তিন হাজার। পরিখা খনন শেষ হলে রাসূল ﷺ তিন হাজার মুহাজির ও আনসারসহ সালা পর্বতের পাদদেশে পরিখা বেষ্টনীর ভিতরে অবস্থান নিলেন। সম্মিলিত কাফির দল পরিখার বাইরে ছাউনি ফেলল। উভয় দলের মাঝখানে পরিখা থাকায় সম্মুখযুদ্ধ সম্ভব ছিল না। তবে উভয় পক্ষে তীর বিনিময় হতো। এক মাসের কিছু কম সময় এ অবরোধ স্থায়ী ছিল। মুসলমানগণ ইতিপূর্বে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হননি। কাফিরদের চেষ্টা ছিল কীভাবে খন্দক পার হওয়া যায়। একদিন আমর বিন আবদে ওদ্দ নামক এক ব্যক্তি, যে আরবের বিখ্যাত বীর ও পালোয়ান ছিল, ইকরামা বিন আবি জাহল, হুবায়রা বিন আবি ওয়াহাব ও দুরাব বিন খাত্তাব বনি কেনানার কিছু যোদ্ধাসহ খন্দকের কাছে আসল। সবদিক ঘুরে দেখল। এক জায়গায় খন্দক অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত দেখে পার হয়ে গেল এবং সালা পর্বত ও খন্দকের মাঝখানের ময়দানে পৌঁছে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। মুসলিম দল থেকে হযরত আলী (রা.) এবং আরো কয়েকজন মুকাবিলায় অগ্রসর হলেন। হযরত আলী (রা.) আমর বিন আবদে ওদ্দকে কতল করে ফেললেন। ফলে তাঁর হাতে আরবের কাফির দলের বিখ্যাত বীর নিহত হলো। অন্যরা পলায়ন করল। (আসাহহুস সিয়ার, পৃষ্ঠা: ১৪৭-১৪৮)

বায়আতে রিদওয়ান ও হযরত আলী (রা.)

ছয় হিজরী জিলকদ মাসে রাসূল ﷺ উমরার

নিয়তে পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হন। প্রথমে যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছেন। এ সময় মক্কা নগরী কাফিরদের দখলে ছিল। হুযূর ﷺ মক্কাবাসীর মনোভাব জানার জন্য যুল হুলায়ফা থেকে বিশর বিন সুফিয়ান নামে এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠান। পথিমধ্যে রাসূল ﷺ উসফান নামক স্থানে পৌঁছলে বিশর বিন সুফিয়ান মক্কার খবর নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন, আমি কুরাইশদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে দেখেছি। তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূল ﷺ সাহাবীগণসহ সফর অব্যাহত রাখলেন। তারপর মক্কার অনতিদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন। রাসূল ﷺ শুধু উমরার জন্য মক্কার পথে রওয়ানা হয়েছেন, যুদ্ধের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তাই হযরত উসমান (রা.) কে কুরাইশদের কাছে এই সংবাদসহ পাঠালেন যে, আমরা উমরার নিয়তে এসেছি, যুদ্ধের জন্য নয়। হযরত উসমান মক্কায় পৌঁছলেন। ইত্যবসরে মুসলিম শিবিরে হযরত উসমানের হত্যার খবর রটে গেল। তখন আল্লাহর নবী একটি গাছের নিচে বসেছিলেন। সাহাবীগণ গাছের নিচে জমা হতে আরম্ভ করলেন। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে বায়আত (শপথ) গ্রহণ করলেন এই মর্মে যে, যদি যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না। এই বায়আতকে 'বায়আতে রিদওয়ান' বলা হয়। হযরত আলী (রা.) বায়আতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। এই বায়আতে যে সকল সাহাবী অংশগ্রহণ করেন তাদের জন্য আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

-আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত আলী (রা.)

রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছেন এ সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে বুদাইল বিন ওরকা কয়েকজন সঙ্গীসহ সেখানে আসলেন। আলাপ আলোচনার পর রাসূল ﷺ বললেন, যদি কুরাইশরা চায় তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে। বুদাইল বিন ওরকা কুরাইশদের কাছে গিয়ে রাসূল ﷺ এর বাণী পৌঁছে দিলেন। তারপর উরওয়া বিন মাসউদ আসলেন। তারপর হুলাইস নামের একজন। উভয় প্রতিনিধি দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর কুরাইশদের কাছে ফিরে গেলেন। সব শেষে সুহাইল বিন আমর প্রতিনিধি হিসেবে আসলেন। এবারে সন্ধির আলোচনা শুরু হলো। এ সন্ধির কিছু কিছু শর্ত বাহ্যত মুসলিম দলের জন্য প্রতিকূল মনে হলেও সকল শর্তই মুসলমানদের জন্য সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে এনেছিল। প্রথমে সন্ধির শর্তাবলি মৌখিকভাবে স্থির হয়। তারপর সন্ধি লেখার সময় এলো। রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) কে সন্ধি লিখার নির্দেশ দিলেন।

হুদায়বিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রটি হযরত আলীর হাতে লিপিবদ্ধ হয়। সন্ধিপত্র লেখা হলে রাসূল ﷺ এর পক্ষে শীর্ষস্থানীয় যেসকল সাহাবা স্বাক্ষর করেন এর মাঝে আলী (রা.) একজন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় স্বাক্ষরকারীগণের নাম-

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত আলী বিন আবি তালিব (রা.), হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা (রা.), কুরাইশদের পক্ষে মাকরাবা বিন হাফস, আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমর।

হযরত আলী (রা.) এর ভাই-বোন

হযরত আলী (রা.) এর তিনজন ভ্রাতা ছিলেন। ১. তালিব ২. আকিল ৩. জাফর। তিনজনই বয়সে হযরত আলীর বড়। প্রতি ভাইয়ের মাঝে দশ বছর বয়সের পার্থক্য ছিল। আর দুজন বোন ছিলেন। উম্মে হানী ও জুমানা। হযরত আলীসহ উল্লিখিত সকল ভাই বোনের মাতা ছিলেন ফাতিমা বিনতে আসাদ। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৩)

[চলবে]

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)	৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)	৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)	২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)	১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)	৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম تسنيم
www.tasneembd.org
▼ কুরআন ▼ হাদীস ▼ আকীদা
▼ ইবাদত ▼ প্রবন্ধ ▼ জীবনী
▼ জিজ্ঞাসা ▼ বই

প্রবন্ধ

স্বশরীরে মিরাজ

মূলঃ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)

অনুবাদঃ মাওলানা মুমিনুল হক

বিশেষ থেকে বিশেষতর, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর, পূর্ণ থেকে পূর্ণতর এবং বিস্ময়কর মুজিযা হচ্ছে মিরাজ। কোনো নবী বা রাসূলকে এমন মুজিযা দেওয়া হয়নি। এই মিরাজ শরীফের মাধ্যমে নবী করীম ﷺ কে মাকামে উলিয়া পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে। সেখানে পৌঁছে তিনি যা অবলোকন করেছেন, তা অন্য কেউই দেখেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।'

ইসরা শব্দের অর্থ নিয়ে যাওয়া, সায়ের বা ভ্রমণ করানো। আল্লাহ তাআলা রাসূলে আকরাম ﷺ কে মক্কা মুকাররামা থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন- এটুকুকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। কেননা তা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। তারপর মসজিদে আকসা থেকে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার নাম হচ্ছে মিরাজ। এটুকু মশহুর হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলে পাক ﷺ এর ভ্রমণের এ অংশটুকু যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে বিদআতী, ফাসিক এবং লাঞ্ছিত। এছাড়া আনুষঙ্গিক ছোটখাটো আশ্চর্যজনক এবং সূক্ষ্ম ঘটনাদি বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলো যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে মূর্খ এবং বঞ্চিত। মিরাজ সম্পর্কে বিশুদ্ধ মাযহাব এই যে, ইসরা এবং মিরাজ উভয়টিই জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে সংঘটিত হয়েছিল। সাহাবা, তাবিঈন এবং তাবে তাবিঈনগণের মশহুর আলিমগণ এবং তাঁদের পর মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং ইলমে কালাম শাস্ত্রবিদগণের মাযহাব এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে বহু সহীহ হাদীস এবং সহীহ খবর মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ আবার এরকম মত পোষণ করেছেন, মিরাজ স্বপ্নে এবং আত্মিকভাবে হয়েছিল। এই দুই মতের সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এর মিরাজ বিভিন্ন সময়ে হয়েছিল। তন্মধ্যে একবার সংঘটিত হয়েছিল জাগ্রত অবস্থায়। অন্যান্য সময় হয়েছিল স্বপ্নযোগে, আত্মিকভাবে। সেগুলোও আবার কিছু হয়েছিল মক্কা মুকাররামায় এবং কিছু হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায়। আর স্বপ্নের মিরাজও ওহী। কেননা এ কথায় ঐকমত্য রয়েছে যে, আম্বিয়া কিরামের স্বপ্নও ওহী। সন্দেহের অবকাশ নেই। নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় তঁদের চোখ মুদিত থাকত, যেমন মুরাকাবার হালতে রাসূলে পাক ﷺ এর চোখ মুবারক মুদিত থাকে। আর এই মুদিত রাখার কারণ হচ্ছে, মুরাকাবার অনুভূতিতে জাগতিক প্রভাব যেন অনুপ্রবেশ করতে না পারে। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ স্বপ্নযোগে যা কিছু লাভ করতেন, তা ছিল তাউতিয়া এবং তায়সির হিসেবে। অর্থাৎ বিধান বা অবস্থাকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সহজসাধ্য করে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। যেমন নবী করীম ﷺ এর কাছে ওহী আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সুস্বপ্ন দর্শন করতেন, যাতে করে ওহীর কঠিন ভার হালকা অনুভূত হয় এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত গুরুদায়িত্বটি সহজে বহন করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা রাসূলে আকরাম ﷺ কে মক্কা মুকাররামা থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন- এটুকুকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। কেননা তা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। তারপর মসজিদে আকসা থেকে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার নাম হচ্ছে মিরাজ। এটুকু মশহুর হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলে পাক ﷺ এর ভ্রমণের এ অংশটুকু যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে সে বিদআতী, ফাসিক এবং লাঞ্ছিত।

নবী করীম ﷺ এর মিরাজ প্রথমে কয়েকবার স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয়েছিল, যেহেতু পরবর্তীতে জাগ্রত অবস্থায় মিরাজ সংঘটিত হবে। আল্লাহ পাকের পরিকল্পনা ছিল সেরকমই। মিরাজ স্বপ্নে হয়েছিল এ কথার প্রবক্তারা বলেছেন, স্বপ্নের মিরাজ নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে হয়েছিল। কোনো কোনো আরিফ বলেছেন, রাসূলে পাক ﷺ এর ইসরা এবং মিরাজ বহুবার সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা এ সংখ্যা চৌত্রিশ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হয়েছিল সশরীরে, জাগ্রত অবস্থায়। আর বাকীগুলো হয়েছিল স্বপ্নযোগে, আত্মিকভাবে। আবার এক শ্রেণি এমন বলে থাকেন, ইসরা যা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত হয়েছিল তা ছিল সশরীরে। আর সেখান থেকে আকাশে যে মিরাজ হয়েছিল, তা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মিক অবস্থায় হয়েছিল। তারা উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে দলীল দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, ইসরার শেষ সীমায় মসজিদে আকসার পরেও হয়ে থাকত, তাহলে কুরআন মাজীদে এর উল্লেখ করা হতো। এ কথা উল্লেখ করলে তো নবী

করীম ﷺ এর বুযুর্গী, সম্মান, প্রশংসা এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত ও বিস্ময় আরও অধিক প্রতিভাত হত। তাঁদের এমন বক্তব্যের উত্তরে বলা হয়েছে, আয়াতে কারীমায় বিশেষ করে মসজিদে আকসাকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, উক্ত স্থানটিকে কেন্দ্র করে ঝগড়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সে স্থানটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী করীম ﷺ যে বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন, মসজিদে আকসা দর্শন করেছেন একথা কুরাইশরা অস্বীকার করেছিল। শুধু তাই নয়, কাফিররা নবী করীম ﷺ এর কাছে মসজিদে আকসার কী কী আলামত রয়েছে, এ সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিল এবং তার অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করে নবী করীম ﷺ কে রীতিমতো পরীক্ষা করেছিল। আর সে কারণেই উক্ত স্থানটির উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে। এটা ইসরার শেষ সীমা বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও রয়েছে। সূরা আন নাজমে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আন নাজমে যা বলা হয়েছে এবং যা ঘটেছে, সেগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু চিন্তাবিদ মন্তব্য করে থাকেন যে, রাসূলে পাক ﷺ হযরত জিবরাইল (আ.) কে দেখেছিলেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করেছিলেন- এটাই বুঝানো হয়েছে আন নাজম এর বর্ণনায়। কিন্তু সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত কথা এটাই যে, এর দ্বারা মিরাজের ঘটনাই বলা হয়েছে।

বান্দা মিসকীন (শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী র.) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ তাকে দেখাব এ উদ্দেশ্যে আমি ভ্রমণ করিয়েছি- এ আয়াতখানা মিরাজের সাথে যুক্ত। কথাটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তার হাবীব ﷺ কে মসজিদে আকসায় নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান থেকে আকাশে নিয়ে গেলেন। আকাশে নিয়ে নিদর্শন দর্শন করানোর কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ তো আকাশেই, আর চূড়ান্ত পর্যায়ের অলৌকিকতা ও মুজিযার বহিঃপ্রকাশ তো সেখান থেকেই হয়ে থাকে। তাই এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তার হাবীব ﷺ এর এই ঘটনা মসজিদে আকসা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি। উর্ধ্বাকাশে যে মিরাজ হয়েছিল, তা শুরু হয়েছিল মসজিদে আকসা থেকে। মসজিদে আকসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওই প্রেক্ষিতেই। নবী করীম ﷺ এর মিরাজ স্বপ্নযোগে সংঘটিত হলে কাফিররা একে অসম্ভব মনে করত না। আর দুর্বল ঈমানদাররা এর কারণে ফিতনায় পতিত হতো না। তাছাড়া স্বপ্নে দর্শনকৃত ঘটনাবলি বাস্তবে সংঘটিত হওয়ার প্রচলন অপ্রসিদ্ধ। ইসরা শব্দের ব্যবহারও স্বপ্নের ক্ষেত্রে হয় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসরা যখন জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে, তখন তার পরবর্তী সংঘটিত মিরাজও বাস্তবেই হয়েছে। এরপরও বলতে হয়, মিরাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে- এরকম প্রমাণও নেই। নবী করীম ﷺ এর মিরাজ শরীফ স্বপ্নযোগে হয়েছে বলে যারা দাবি করেন তাদের সন্দেহের কারণ কয়েকটি। যথা:

১. 'যা আমি আপনাকে দেখিয়েছি ওই স্বপ্নকে আমি কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য বানিয়েছি।' এই আয়াতকে কোনো কোনো মুফাসসির মিরাজের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে থাকেন। কেননা 'রুইয়া' নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে কিছু দেখাকে বলা হয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এখানে 'রুইয়া' বা স্বপ্ন শব্দ উল্লেখ করে হুদায়বিয়া বা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকেই বুঝানো হয়েছে। আহলে ইলম 'রুইয়া' শব্দকে চাক্ষুষ দর্শন অর্থেও প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন কবি মুতানাব্বি তার কবিতায় বলেছেন। কোনো কোনো আহলে ইলম বলেছেন, যেহেতু মিরাজ শরীফ রাত্রি বেলায় হয়েছে তাই এক্ষেত্রে 'রুইয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'অতঃপর আমি জাগ্রত হলাম'- এ কথায়ও প্রমাণ হয়, মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল। 'আমি জাগ্রত হলাম' এ কথার তাৎপর্য এই যে, ফিরিশতা আসার পূর্বে তিনি নিদ্রায় ছিলেন। সেই নিদ্রা থেকে তিনি জাগলেন এবং জিবরাইল (আ.) তাকে বুরাকে সাওয়ার করিয়ে নিলেন। অথবা এর অর্থ এও হতে পারে, মিরাজের যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর পরবর্তী নিদ্রা থেকে তিনি জাগ্রত হলেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, আমি জেগে উঠতেই দেখি মসজিদে হারামে শুয়ে আছি। এখানে জেগে উঠার অর্থ হতে পারে যখন সকাল হলো তখন আমি মসজিদে হারামে। অথবা জাগ্রত হওয়ার কথা সম্ভবত, নবী করীম ﷺ অন্য কোনো নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যা বাইতুল হারামে আসার পর হয়েছিল।

নবী করীম ﷺ এর ইসরা সারা রাতব্যাপী ছিল না, বরং রাতের কিছু অংশে হয়েছিল। কোনো কোনো মুহাক্কিক বলেন, ইসতেকাফ এর অর্থ ইফাকা অর্থাৎ চেতনতা। উক্ত চেতনাবস্থা থেকে মিরাজের অবস্থায় উপনীত হওয়া। নবী করীম ﷺ কে যখন আসমান ও যমীনের মালাকুতের বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো দেখানো হয়েছিল, মালায়ে আলা এবং তথাকার আল্লাহ তাআলার বড় বড় নিদর্শনাবলি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভেদের বস্তুসমূহ অবলোকন করানো হয়েছিল, তখন তাঁর হাল অত্যন্ত কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর বাতিন বা অন্তর্জগত নিদ্রার অবস্থা সদৃশ হয়ে গিয়েছিল। আহলে ইলমগণ বলেন, মালাকুত অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুদরতের জগত দর্শনকালে তিনি যদিও জাগ্রত ছিলেন, তথাপিও সে অবস্থাটা ছিল একপ্রকারের অনুভূতির অনুপস্থিতি। আর সে অবস্থাটাকেই আহলে ইলম নিদ্রা ও জাগরণ এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা জাগ্রত অবস্থা-ই। কিন্তু অনুভূতির অনুপস্থিতিকে কেউ কেউ নিদ্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনাতেও এরকম এসেছে, তিনি ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি তখন নিদ্রা ও জাগরণ দু'এর মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। কেউ কেউ এই হাদীসের ব্যাখ্যা এরকম করেছেন যে, নাওম এর অর্থ হলো, তিনি নিদ্রিতদের মতো শায়িত ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমি তখন হাজারে আসওয়াদের নিকটে প্রায় শায়িত অবস্থায় ছিলাম। আবার কখনও এক পাশে শায়িত ছিলাম -এরকম বলা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) কিন্তু এরকম অবস্থা অবলোকন করেননি। তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা শুনেছেন।

মিরাজের ঘটনা হিজরতের পূর্বে ঘটেছিল। আর হযরত আনাস (রা.) তো হিজরতের পর নবী করীম ﷺ এর সাহচর্যে গিয়েছিলেন। তদুপরি তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বা আট বছর। আলিমগণ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের অবস্থাও একই। তিনি বলেছেন, রাসূলে পাক ﷺ এর দেহ মুবারক সে রাত্রিতে বিছানা থেকে হারিয়ে যায়নি। আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর এই হাদীসটি ওই সম্প্রদায়ের দলীল, যারা বলেন, নবী করীম ﷺ এর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল স্বপ্নযোগে।

একদল আলিম বলেন, নবী করীম ﷺ এর নবুওয়াত প্রকাশের এক বা দেড় বছর পর ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের উক্ত মতানুসারে তো হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর তখন ধারণা ও স্মরণশক্তিই ছিল না। বরং এমনও হতে পারে যে, তখন তাঁর জন্মই হয়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

মোটকথা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর এই হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসদ্বয়ের তুলনায় অগ্রগণ্য নয়, যা দর্শনের ভিত্তিতে বিবৃত হয়েছে। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে পাক ﷺ এর দেহ মুবারক আমার থেকে হারিয়ে যায়নি। এই হাদীসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে ভুল। পবিত্র কালামে উল্লেখ করা হয়েছে 'এবং চোখ যা দর্শন করেছে, অন্তর তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।' এই আয়াতটি স্বপ্নদর্শনকে প্রমাণিত করে না। আয়াতখানার সুস্পষ্টভাব হচ্ছে, তিনি চোখে যা দেখেছেন, তার হৃদয় তাকে অবাস্তব দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেনি। বরং তার চোখের দর্শনকে অন্তর স্বীকৃতি দিয়েছে, অস্বীকার করেনি। তার দলীল হচ্ছে এই আয়াত, 'ওই সময় তার চোখ বিচ্যুত হয়নি এবং অবাধ্য হয়নি।'

এখন আলোচনায় আসা যাক, দার্শনিকদের বাতিল এবং মনগড়া যুক্তি প্রসঙ্গে। তারা বলে থাকে, ভারি দেহ কখনও ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে না। তাছাড়া আকাশের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হওয়া এবং তা মিলিত হয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এ জাতীয় কথাবার্তা ইসলামী তরীকায় পরিত্যাজ্য এবং অনর্থক। আরেকদল আছে, যারা মিরাজকে আত্মিক বলে ধারণা করে থাকে। তারা এ মিরাজের উপর অনুমান করে হাশরকেও আত্মিক বলে আখ্যায়িত করে। তারা যে মিরাজকে আত্মিক বলে, তা এই অর্থে নয় যে, স্বপ্নযোগে আত্মার মিরাজ হয়েছিল। বরং তারা আত্মার বিভিন্ন মাকাম ও অবস্থায় আরোহণ এবং পূর্ণতায় পৌঁছা- এরূপ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে থাকে। যেমন তারা বলে থাকে, জিবরাইল এর অর্থ মুহাম্মদ ﷺ এর আত্মা, বুরাকের অর্থ তাঁর নফস যা রূহের বাহন ছিল, যার স্বভাব হচ্ছে অবাধ্যতা। এটা কখনও বাধ্য হয় না, যতক্ষণ রূহানী শক্তি তার উপর প্রবল না হয়। তারা আকাশের অর্থ করে নৈকট্যের মাকাম, সিদরাতুল মুনতাহার অর্থ করে চূড়ান্ত মাকাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সম্প্রদায়টি তাদের এমন মনগড়া ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনার– ফিরআউন, লাঠি, জুতা ও ওয়াদী ইত্যাদি সম্পর্কেও মনগড়া অর্থ করে থাকে। তারা শব্দ ও বাক্যের বাহ্যিক অর্থকে স্বীকার করলেও বলে, ইলম ও মারিফত বলে একটি বস্তু আছে এবং তারও আলাদা স্তর আছে। তাদের অনুমান অনুসারে হাশর ও মিরাজ আত্মিক ও দৈহিক- এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। ইমাম গযযালী (র.) এই ধারণার চক্রাবালে পতিত হয়েছেন। হাশরকে যদি আত্মিক মনে করা হয়, শাব্দিক অর্থের গুরুত্ব না দিলে এবং আকৃতিগতভাবে হাশর হবে বলে মনে না করলে, সুস্পষ্ট কুফুরী করা হবে ও সীমালঙ্ঘন হবে। ইহা হলো বাতিনিয়াদের মাযহাব।

বান্দা মিসকীন (শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী র.) বলেন, রুচিবান ঈমানদারের নিকট প্রথম পন্থাও অসম্ভব ও অস্বীকৃতির ইঙ্গিতবাহক। বস্তুত, এরা আকৃতি জগতকে স্বাভাবিক দায়েরায়ে ইমকান বা সম্ভাব্যের বৃত্ত থেকে দূরবর্তী মনে করে বলে ভাবার্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমান হচ্ছে শোনা এবং মানার নাম, যেমন মিরাজের ঘটনায় সাইয়্যিদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) করেছিলেন। আর সেদিন থেকেই তিনি সিদ্দীক নামে ভূষিত। আর এই ঘটনাকে অবিশ্বাস করে কোনো কোনো দুর্বল ঈমানদার তো ঈমানের বৃত্ত থেকে বেরিয়েও গিয়েছিল। ইলমুল ইয়াকীন তো প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা, উচ্চ বাচ্য করা, ভাবার্থের দিকে ঝুঁকে পড়া সম্ভাব্য অসম্ভাব্য নিয়ে যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণ করা, বুদ্ধি এবং তার মাধ্যম দ্বারা তাকে বন্দী করা ঈমান এবং বন্দেগি থেকে দূরে থাকার লক্ষণ।

আমাদের অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার চাইতে বড় দলীল আর কিছু হতে পারে না। আমরা তার কাছ থেকে যা শুনব তাই আমল করব। যে সম্প্রদায় এই কাজটিকে তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ বলে থাকে, তারা জানে না আমরা কার তাকলীদ করে থাকি। আমাদের তাকলীদ বা অনুসরণ তো ওই মহান পয়গম্বরের তাকলীদ যার পয়গম্বরী সাব্যস্ত হয়েছে মুজিযাসমূহের মাধ্যমে। সুসাব্যস্ত জনের তাকলীদ করাই প্রকৃত তাকলীদ আর এটা কোনো গতানুগতিক তাকলীদ নয়। এটা সিরাতে মুস্তাকীমের অনুসরণেরই নামান্তর। অন্ধ মুকাল্লিদ তো তোমরাই, যারা স্বীয় বুদ্ধিবাদিতার তাকলীদ করে থাকো এবং প্রবৃত্তির নির্দেশ মতো চলো, যার সত্যাসত্য সুসাব্যস্ত নয়। এ পথ দ্বিধা ও সন্দেহে ভরা। দার্শনিকেরা তো মূলত আম্বিয়া কিরামের সিলসিলাকেই অস্বীকার করে থাকে। তাদের কথায় প্রয়োজন কী? তাদের নবী তো তাদের বুদ্ধি। যুক্তিবাদী ও তর্কবাগীশদের কী যে হলো। চলার পথ সহজ সরল হওয়া সত্ত্বেও তারা পথচ্যুত। রাস্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা কথা বলে কেন? সন্দেহের অবতারণা করে মতানৈক্যের সৃষ্টি করে কেন? তর্কবাগীশদের নিয়ত যদিও দার্শনিকদের বিপরীত, তবু পথ চলার দিক দিয়ে তারাও স্বীয় প্রবৃত্তি এবং দার্শনিকদের দর্শনশাস্ত্রের অনুসরণ করে। এতে করে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে যাচ্ছে।

[ঈষৎ পরিমার্জিত]

বিভিন্ন শব্দে দুরূদ শরীফ ও দালাইলুল খাইরাত

মুফতী মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করা মকবূল আমলসমূহের অন্যতম। নবী করীম ﷺ এর ইশক ও মহব্বত লাভ করার জন্য সালাত ও সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিভিন্ন দুরূদ শরীফ বর্ণিত হয়েছে। তেমনি সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, আইম্মায়ে কিরাম থেকেও বিভিন্ন শব্দে দুরূদ শরীফ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম জাযূলী এ সকল দুরূদ শরীফকে একত্রিত করে দালাইলুল খাইরাত কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসায় বলিষ্ঠ শব্দ যোগে অনেক দুরূদ লিখেছেন। দালাইলুল খাইরাত কিতাবকে দুরূদ শরীফের মকবূল ওযীফা হিসেবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল আলিম গ্রহণ করেছেন। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন তরীকায় এ কিতাবকে গুরুত্বপূর্ণ ওযীফা হিসেবে পাঠ করা হয়।

দেওবন্দী আকাবিরগণও এটাকে তাদের ওযীফা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আশিকে ইলাহী মিরাঠী তার 'তাযকিরাতে রশিদ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সনদসহ দালাইলুল খাইরাতের ইজাযত প্রদান করতেন শায়খ মাখদুম বখ্শ রামপুরী থেকে, তিনি শায়খুদ দালাইল আবদুর রাহমান আল মাদানী থেকে। এভাবে সনদের শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করতেন।'

তাছাড়া মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তার 'ইমদাদুল ফতওয়া'র ৪র্থ খণ্ডের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় 'দালাইলুল খাইরাত' ওযীফা হিসেবে পাঠ করা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'এটি অনুমতি নিয়ে পাঠ করা উত্তম।'

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী তার 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবের ৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'দালাইলুল খাইরাত আমাদের বুযুর্গদের ওযীফা।'

উল্লেখ্য, থানবী সাহেব দুরূদ শরীফের ফযীলতের উপর 'যা-দুস সাঈদ' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। তাতে তিনি ৪০ টি দুরূদ বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ২৫ টি দুরূদ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। আর বাকী ১৫ টি সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত। তাছাড়া থানবী সাহেব বুযুর্গানে কিরাম থেকে বিভিন্ন প্রকার দুরূদ বর্ণিত থাকার প্রমাণ হিসেবে 'দালাইলুল খাইরাত' কিতাবের নামও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মাশায়িখে কিরাম থেকে শত শত (দুরূদের) শব্দাবলি বর্ণিত আছে। 'দালাইলুল খাইরাত' তার একটি নমুনা। কিন্তু এখানে কেবল মাত্র সালাত ও সালামের যে সকল শব্দ হাকীকী অথবা হুকমীভাবে মারফু হাদীসে বর্ণিত রয়েছে এর মধ্য হতে ৪০টি (ভিন্ন ভিন্ন) শব্দ উল্লেখ করা হলো। তন্মধ্যে ২৫টি শব্দ সালাতের ও ১৫টি সালাম প্রসঙ্গে। (যা-দুস সাঈদ, পৃষ্ঠা: ২৬) [বিস্তারিত 'যা-দুস সাঈদ' কিতাবের ২৬-৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

দেওবন্দী বিশিষ্ট দু'জন আলিমের উপরোক্ত বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয় যে, দালাইলুল খাইরাত ওযীফাসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ওযীফা। এর থেকে পরিপূর্ণরূপে বরকত লাভ করতে হলে নিজের বুযুর্গের কাছ থেকে ইজাযত নিয়ে পড়তে হয়। এমনকি অন্যান্য ইলমের ন্যায় এরও সনদ গ্রহণ করে পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নামাযের মধ্যে পঠিত সর্বোত্তম দুরূদ হলো দুরূদে ইবরাহীমী। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা দুরূদ পড়ার জন্য দুরূদের ভিন্ন ভিন্ন সীগাহ আছে, যেগুলো সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, সালফে সালিহীন থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আশিক উম্মতরা যখন রাসূল ﷺ এর প্রশংসা ও মর্যাদাসূচক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে দুরূদ পাঠ করেন তখন সালাফী নামধারী লা-মাযহাবীরা সেটাকে বিদআত বলে ফতওয়া দেন। অথচ এমন দুরূদ পাঠ করা জায়িয হওয়ার জন্য দলীল হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত দুরূদগুলোই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে আরব-আযমে সুপ্রসিদ্ধ হাদীসের ইমাম হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁর লিখিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' কিতাবের 'বাবুস সালাত আলান নাবী' পরিচ্ছেদে লিখেন-

والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه واستدل على ذلك بأختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن علي وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبري والطبراني وابن فارس وأوله اللهم داحي المدحوات إلى ان قال اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك.

-দুরূদ শরীফ পরিপূর্ণ ও অধিক বলিষ্ট শব্দের দ্বারা পাঠ করা উত্তম। এর দলীল হলো, সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন শব্দের দ্বারা দুরূদ বর্ণিত হওয়া। এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস রয়েছে, যা সাঈদ ইবনে মানসুর, তাবারী ও তাবারানী এবং ইবনে ফারিস বর্ণনা করেছেন। যার শুরুটা এ রকম- اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ আর শেষে রয়েছে- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ (ফতহুল বারী, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো দুরূদ শরীফ অধিকতর পরিপূর্ণ ও বলিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে পড়াই উত্তম। তিনি সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন শব্দে দুরূদ পড়ার বর্ণনা থেকে এর দলীল গ্রহণ করেছেন।

সালাফী নামধারী ওয়াহাবীরা দুরূদে ইবরাহিমী (নামাযের দুরূদ) ছাড়া অন্য সকল দুরূদকে নাজায়িয বলে থাকেন। তাই তারা দালাইলুল খাইরাত পড়াকে গর্হিত কাজ মনে করেন। তাদের এ মূর্খতা দূর করার জন্য বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র 'বাবুস সালাত আলান নাবী' পাঠ করা উচিত। সেখানে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সনদসহ দুরূদ এর অনেক সীগাহ বা শব্দ উল্লেখ করেছেন, যা থেকে বিভিন্ন শব্দে দুরূদ পড়া জায়িয হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে ইবনে হাজার আসকালানীর ছাত্র ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর

রহমান আস-সাখাবী'র (৮৩১-৯০২ হিজরী) 'আল-কাউলুল বাদী' কিতাবের في الأمر بالصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ের ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করুন। দেখবেন সাহাবা ও তাবিঈন থেকে দুরূদের অসংখ্য সীগাহ (শব্দরূপ) বর্ণিত আছে।

সালাফী নামধারী লা-মাযহাবীরা দুরূদ শরীফের বিভিন্ন সীগাহকে নাজায়িয মনে করেন। অথচ তাদের আলিমগণই তাদের বিভিন্ন কিতাবাদির ভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন সীগার মাধ্যমে হামদ ও সানার পর নবী করীম ﷺ এর উপর দুরূদ লিখেছেন। এ সকল লেখকদের দুরূদের সীগাহ সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা এবং নিজ থেকে তৈরি করা। প্রত্যেকে নিজ থেকেই নবী করীম ﷺ এর লকব ও সিফাতসমূহ উল্লেখ করে দুরূদ লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ লা-মাযহাবীদের ইমামগণসহ অন্যান্য সুন্নী মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ তাঁদের কিতাবের শুরুতে যে দুরূদ শরীফ উল্লেখ করেছেন তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

হাফিয ইবনু কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ

হাফিয ইবনুল কায়্যিম 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' কিতাবের শুরুতে যে দরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

فَصَلَّى اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَنْبِيَاؤُهُ وَرُسُلُهُ وَالصَّالِحُونَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمَا وَحَّدَ اللهَ وَعَرَّفَ بِهِ وَدَعَا إِلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

আল্লামা শাওকানী

লা-মাযহাবীরা আল্লামা শাওকানীকে তাদের ধারার প্রসিদ্ধ আলিম মনে করে থাকেন। আল্লামা শাওকানী 'নাইলুল আওতার' কিতাবের শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُنْتَقَى مِنْ عَالَمِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ. الْمُصْطَفَى لِحَمْلِ أَعْبَاءِ أَسْرَارِ الرِّسَالَةِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ بَيْنِ الْعِبَادِ. الْمَخْصُوصِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى فِي يَوْمٍ يَقُولُ فِيهِ كُلُّ رَسُولٍ: نَفْسِي نَفْسِي، وَيَقُولُ: " أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا ".الْقَائِلِ: " بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ " أَكْرِمْ بِهَا مَقَالَةً مَا قَالَهَا نَبِيٌّ قَبْلَهُ وَلَا نَالَهَا. وَعَلَى آلِهِ الْمُطَهَّرِينَ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْنَاسِ وَالْأَرْجَاسِ. الْحَافِظِينَ لِمَعَالِمِ الدِّينِ عَنْ الِانْدِرَاسِ وَالِانْطِمَاسِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْجَالِينَ بِأَشِعَّةِ بَرِيقِ صَوَارِمِهِمْ دَيَاجِرَ الْكُفْرَانِ. الْخَائِضِينَ بِخَيْلِهِمْ وَرَجْلِهِمْ لِنُصْرَةِ دِينِ اللهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ كُلَّ مَعْرَكَةٍ تَتَقَاعَسُ عَنْهَا الشُّجْعَانُ.

ইমাম ইবনে হিব্বান

ইমাম ইবনে হিব্বান (র.) 'আল ইহসান' কিতাবের শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

والصَّلاة والسَّلام الأتمام الأكملان علىٰ سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان، المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان، وعلىٰ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، صلاة دائمة ما كرَّ الجديدان وعُبِدَ الرحمٰنُ.

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী

আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী 'তাফসীরে তাবারী' কিতাবের শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ، رسول الله وخيرته من خلقه، خاتم النبيين، وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. فصلَّى الله على نبيّنا كلَّما ذكره الذاكرون، وغفَل عن ذكره الغافلون. وصلى الله عليه في الأوَّلين والآخرين. أفضلَ وأكثرَ وأزكى ما صلَّى على أحدٍ من خلقه. وزكّانا وإياكم بالصلاة عليه، أفضلَ ما زكّى أحدًا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته– (تفسير الطبري)

ইমাম বায়যাবী

ইমাম বায়যাবী তাফসীরে বায়যাবীর শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

صَلِّ عليه صلاة توازي غناءه، وتجازي غناءه، وعلَى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا، وأفضْ علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم، وسلِّم عليهم وعلينا تسليما كثيرا. (تفسير البيضاوي)

আবুস সাউদ আল ইমাদী

আবুস সাউদ আল ইমাদী 'তাফসীরে আবিস সাউদ' কিতাবের শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار ما تناوبت الأنواء وتعاقبت الظلم والأضواء وعلى من تبعهم بإحسان مدى الدهور والأزمان. (تفسير أبي السعود، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ٩٨٢هـ)

নাসির উদ্দীন আলবানী

লা-মাযহাবীদের ইমাম নাসির উদ্দীন আলবানী 'সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ' কিতাবের শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بحديثه وسننه الصحيحة اهتدينا، المخاطب بقوله تعالى في القرآن الكريم: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وعلىٰ آله وصحبه الغر الميامين، الذين أثنى الله عليهم بقوله: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وعلى من اقتدى بهم وسار علىٰ منهجهم إلى يوم الدين.

আল্লামা আলুসী

আল্লামা আলুসী (র.) তাফসীরে রুহুল মাআনী'র শুরুতে যে দুরূদ লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

وصلاةً وسلامًا على أول ذرة أضاءت من الكنز المخفي في ظلمة عماء القدم فأبصرتها عين الوجود وعلة إيجاد كل ذرة برأتها يد الحكيم إذ تردت في هوة العدم فعادت ترفل بأردية كرم وجود مهبط الوحي الشفاهي الذي أرتفع رأس الروح الأمين بالهبوط إلى موطيء أقدامه ومعدن السر الألهي الذي أنقطع فكر الملأ الأعلى دون ذكر الوصول إلى أدنى مقامه فهو النبي الذي أبرزه مولاه من ظهور الكمون إلى حواشي متون الظهور ليكون شرحا لكتاب صفاته وتقريرا ورفعه بتخصيصه من بين العموم بمظهرية سره المستور وأنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج ليكون للعالمين نذيرا وشق له من أسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ومغارب أسرار التأويل الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة المحمدية فما برحوا حتى ربحوا فباعوا نفوسا وشروا نفيسا وقطعوا أسباب العلائق بالهمم الحقيقية فما عرجوا حتى عرجوا فلقوا عزيزا وألقوا خسيسا فهم النجوم المشرقة بنور الهدى والرجوم المحرقة لشياطين الردى رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى متبعيهم وأولاهم ما سرحت روح المعاني في رياض القرآن وسبحت أشباح المباني في حياض العرفان–

শেষকথা

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিভিন্ন শব্দে দুরূদ শরীফ পাঠ করা জায়িয। সাহাবায়ে কিরামের আমলের মধ্যে এর দলীল রয়েছে। এমনকি লা-মাযহাবী আলিমগণও নিজস্ব শব্দে দুরূদ শরীফ লিখেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মর্যাদাজ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন শব্দে দুরূদ শরীফ লেখা ও পাঠ করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাজ

আহমদ হাসান চৌধুরী

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

পবিত্রতা ও মহিমা সেই মহান সত্তার, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম থেকে (জেরুজালেমের) মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি তাকে আমার নিদর্শন-সমূহ দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াত শুরু করেছেন সুবহান (سُبْحَانَ) শব্দ দিয়ে। আমরা যখন আশ্চর্যান্বিত বা বিস্ময়কর কোনো ঘটনা শুনি বা দেখি তখন আমরা বলি سُبْحَانَ الله সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই শব্দ দ্বারা আয়াত শুরু করে এটাই বুঝাচ্ছেন যে আমি বিস্ময়কর এক ঘটনা বর্ণনা করছি।

ইসরা বলা হয় রাত্রিকালীন ভ্রমণকে। এর ব্যবহার কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় এসেছে فَأَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْنَ

ইসরা শব্দের অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। এরপরও আয়াতে لَيْلًا (রাত) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রহস্যের ভিত্তিতে। প্রথম لَيْلًا বা রাত শব্দ নাকারাহ বা অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর আরবী ভাষায় অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত শব্দ-শব্দপ্রয়োগের একাংশের অর্থ প্রকাশও করে থাকে, অর্থাৎ لَيْلًا লাইলান বা রাত শব্দটি উল্লেখ করে রাতের আংশিক সময়কে বুঝানো হয়েছে। অতএব মিরাজ সারা রাত্রব্যাপি হয়নি, বরং রাতের সংক্ষিপ্ত সময়ে মিরাজের মতো এক সুবিশাল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর মসজিদে আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা তারপরে আল্লাহর আরশে গিয়ে মহান রবের সাথে সাক্ষাতকে মিরাজ বলে। মিরাজ সম্পর্কে সহীহ সনদে অনেক সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

মিরাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল বলে কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু জমহুর উলামায়ে কিরামের মত হলো মিরাজ স্বশরীরে হয়েছে। এর স্বপক্ষে অনেক সাহাবীর বর্ণনা আছে। যারা মিরাজকে স্বপ্নযোগে বলতে চান তারা দুজন সাহাবীর হাদীসকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। একজন আম্মাজান হযরত আয়িশা (রা.), অন্যজন হযরত মুআবিয়া (রা.)। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর জবাবে বলেছেন এ দুজন সাহাবীর হাদীস দিয়ে মিরাজ স্বপ্নযোগে প্রমাণ হয় না। কেননা, যখন মিরাজ সংঘটিত হয়েছে তখন আম্মাজান আয়শা সিদ্দীকা (রা.) অল্প বয়স্কা ছিলেন। রাসূল ﷺ এর সাথে তখনও তার শাদী মুবারক হয়নি। আর মুআবিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন মক্কা বিজয়ের এক বছর পূর্বে। মিরাজের সময় তিনি মুসলমান ছিলেন না। তাই বহুসংখ্যক জলীলুল কদর সাহাবীর মুকাবিলায় তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

জমহুর মুফাসসিরীনে কিরাম এর মত হলো মিরাজ স্বশরীরে হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা আয়াত শুরু করেছেন سُبْحَانَ (সুবহান) শব্দ দিয়ে। যা দ্বারা বিস্ময়কর ঘটনা বুঝায়। স্বপ্নযোগে মিরাজ অসম্ভব কিছু না। এটা বিস্ময়করও হতো না। তাছাড়া পরবর্তী শব্দ بِعَبْدِهِ (আবদ) দ্বারা রূহ এবং দেহের সমন্বয়কে বুঝায়। এটা থেকেও বুঝা যায় রাসূল ﷺ স্বশরীরে মিরাজে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত আল্লাহ তাআলা তার হাবীব ﷺ কে عبد (আবদ) বলেছেন। যার অর্থ বান্দাহ। এটা আমাদের নবীর জন্য অত্যন্ত সম্মানের যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বান্দাহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মালিক যখন তাঁর দাসকে দাস বলে স্বীকার করে তখন দাসের জন্য সেটা পরম সৌভাগ্য। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি বান্দাহ নবী হতে চান নাকি বাদশাহ নবী? রাসূল ﷺ বলেছেন আমি বান্দাহ নবী হতে চাই।

অনেকে যুক্তি বা বিজ্ঞান দিয়ে মিরাজ প্রমাণ করতে চান। এটা ঠিক নয়। কারণ মুজিযাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার অবকাশ নেই। মুজিযা অর্থই তো অক্ষম করে দেওয়া। যুক্তিতে ধরুক বা না ধরুক মুজিযা বিশ্বাস করতে হবে। তবে এটা ঠিক যে, বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর বিশ্বাস করতে মানুষের জন্য সুবিধা হয়েছে। যেমন রকেট, বিমান, ফোন ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে সময়, দূরত্ব, গতির ব্যাপারে মানুষ পূর্বের ধারণা থেকে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারছে।

মিরাজের রাতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো- রাসূল ﷺ উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন, কোনো বর্ণনা মতে শিআবে আবী তালিবে ছিলেন, কোনো বর্ণনা মতে হাতীমে ছিলেন, আবার কোনো বর্ণনা মতে মসজিদে হারামে ছিলেন। বর্ণনাগুলোর সামঞ্জস্য এভাবে করা যায় যে, রাসূল ﷺ উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন, ঘরটি ছিল শিআবে আবী তালিবে অবস্থিত, যা হাতীমের নিকটবর্তী। সেখান থেকে রাসূল ﷺ কে শক্কে সদর করার জন্যে মসজিদে হারামে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখান থেকে বুরাকে আরোহন করানো হয়। বুরাক সম্পর্কে হাদীসে সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে এটি খচ্চর থেকে ছোট আর গাধা থেকে বড়। এটি একটি জান্নাতী প্রাণী। বলা হয়েছে তার দু'পায়ের দুরত্ব দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। অনেকে বুরাকের কাল্পনিক ছবি এঁকেছে। এটা সম্পূর্ণ ভূয়া। আবার আমাদের মধ্যে অনেকে বরকত মনে করে এই কাল্পনিক বোরাকের ছবি ঘরের দেয়ালে রাখেন। অথচ হাদীস হলো-

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تصاوير

-এমন ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করেন না যে ঘরে কোনো প্রাণীর ছবি থাকে।

রাসূল ﷺ যখন বোরাকের উপর আরোহণ করতে ইচ্ছা করলেন তখন সে একটু নড়া-চড়া করতে লাগলো। হযরত জিবরাইল (আ.) তাকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার কি হলো? আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয়নবী ﷺ এর চেয়ে অধিকতর কোনো সম্মানী ব্যক্তি তোমার উপর আরোহণ করেনি। এ কথাটি শ্রবণ করা মাত্র সে শান্ত হয়ে গেল।

হাদীস শরীফে এসেছে, শাদ্দাদ বিন দাউস কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, পথিমধ্যে এমন এক প্রান্তর অতিক্রম করলাম যেখানে অসংখ্য খেজুর বৃক্ষরাজি দৃষ্টিগোচর হল। জিবরাইল (আ.) বললেন, এখানে অবতরণপূর্বক দুরাকআত নামায আদায় করুন। আমি অবতরণ করে নামায পড়লাম। জিবরাইল (আ.) বললেন, জানেন কি আপনি কোন স্থানে নামায পড়লেন? আমি বললাম, না, তা আমার জানা নেই। জিবরাইল (আ.) বললেন, আপনি ইয়াসরিব অর্থাৎ পবিত্র মদীনায় নামায পড়লেন, যেখানে আপনি হিজরত করবেন। অতঃপর পুনরায় যাত্রা শুরু হলো। অপর এক স্থানে এসে জিবরাইল (আ.) আবার অবতরণপূর্বক নামায আদায় করতে বললেন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাইল বললেন, এ জায়গার নাম সীনা উপত্যকা। এখানে ছিল একটি বৃক্ষ। এর নিকটে মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। আপনি সেই বৃক্ষের কাছেই নামায পড়লেন। আবার আরেকটি প্রান্তর অতিক্রম কালে জিবরাইল (আ.) তথায় নামায পড়তে বললে আমি নেমে নামায পড়লাম। জিবরাইল (আ.) বললেন, আপনি মাদায়েনে নামায পড়লেন। এখানে নবী শোয়াইব (আ.) এর বাসস্থান ছিল। আবার যাত্রা শুরু হলো। আরেক স্থানে পৌঁছে জিবরাইল (আ.) পুনরায় নামায পড়তে বললেন। আমি নামায পড়লাম। জিবরাইল (আ.) বললেন, এটা বাইতুল লাহাম, যেখানে ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। (ইবনে আবূ হাতিম, বাইহাকী, বাযযার এবং তাবরানী শাদ্দাদ বিন আউস থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

এই হাদীস থেকে আমরা দলীল পাই যে নেককারগণ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, ইন্তিকাল করেন, বসবাস করেন সেটা বরকতপূর্ণ। কুরআন শরীফেও এর দলীল আছে। ইসরার আয়াতের শেষাংশ হলো الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি) মুফাসসিরগণ বলেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের চারপাশ বরকতের কারণ হলো এখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং নেককারদের আবাসস্থল ছিল।

হুযূর ﷺ বুরাক পৃষ্ঠে আরোহী হয়ে চলছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ তাঁকে ডাকলো। জিবরাইল (আ.) বললেন, সামনে চলুন। এদিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই। কিছুটা অগ্রসর হবার পর আরেক বৃদ্ধ তাঁকে ডাক দিলে জিবরাইল (আ.) বললেন, সামনে চলুন। আরো কিছুটা পথ অতিক্রান্ত হলে একটি জামাত হুযূর ﷺ কে সালাম জানালেন।

السلام عليك يا اول، السلام عليك يا اخر، السلام عليك يا حاشر .

আসসালামু আলাইকা ইয়া আউয়াল।
আসসালামু আলাইকা ইয়া আখির।
আসসালামু আলাইকা ইয়া হাশির।

জিবরাইল (আ.) তাদের সালামের উত্তর দিতে বললেন। অতঃপর জানালেন, প্রথম বৃদ্ধা হলো দুনিয়া। দ্বিতীয় বৃদ্ধটি হলো শয়তান। উভয়ের উদ্দেশ্য পার্থিবতার দিকে আকর্ষণ করানো। যদি আপনি তাদের ডাকে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত। আর যারা আপনাকে সালাম জানিয়েছে তারা হলেন ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)। ইবনে জারীর এবং বাইহাকী এই হাদীসখানা আনাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

মুসলিম শরীফে আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিরাজের রজনীতে মূসা (আ.) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে কবরের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি।

বাইহাকী শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমি এবং জিবরাইল (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করি। আমরা দুই রাকাআত নামায আদায় করি। সেখানে অনেক লোকের সমাগম হলো। একজন মুআযযিন আযান দিলেন, ইকামতও দেওয়া হলো। আমরা সকলে কাতারবন্দী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কে ইমাম হবেন। এমন সময় জিবরাইল (আ.) আমার হাত ধরে আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন, আমি সকলের ইমামতী করলাম। নামায শেষে জিবরাইল (আ.) আমাকে বললেন আপনি কি জানেন আপনার পিছনে কারা নামায আদায় করেছেন? আমি বললাম না। তিনি বললেন পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলেই আপনার পিছনে নামায আদায় করেছেন।

নামায শেষে প্রিয়নবী ﷺ যখন বাইরে তাশরীফ আনলেন তখন জিবরাইল তাঁর সম্মুখে দুটি পাত্র রাখলেন। একটিতে ছিল দুধ আরেকটিতে ছিল শরাব। প্রিয়নবী ﷺ দুধ বেছে নিলেন। জিবরাইল (আ.) বললেন, আপনি স্বভাব ধর্মকে পছন্দ করেছেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রাসূল ﷺ জিবরাঈল আমীনকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা দিলেন। প্রথম আসমানে যাওয়ার পর দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করলেন কে? জিবরাঈল (আ.) উত্তর দিলেন আমি জিরাঈল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সাথে কে? জিবরাঈল (আ.) বললেন মুহাম্মদ ﷺ। জানতে চাওয়া হলো তাঁকে আনার জন্যেই কি আপনি আদিষ্ট হয়েছেন? জিবরাঈল (আ.) বললেন হ্যা! আমাকে তাঁর কাছেই পাঠানো হয়েছে। দ্বার খুলে দেওয়া হলো। প্রথম আসমানে প্রবেশ করে রাসূল ﷺ হযরত আদম (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করলেন। আদম (আ.) তাকে স্বাগত জানালেন **مَرْحَباً بِالابْنِ الصالحِ والنبيِّ الصالحِ** হে সুসন্তান, হে সৎ নবী! আপনাকে স্বাগতম। অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসূফ (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আ.), পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন।

ইবরাহীম (আ.) প্রিয়নবী ﷺ কে বলেন আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম দিবেন, আর বলবেন জান্নাতের পানি এবং ফল খুবই মিষ্টি, এর মাঠ ফাঁকা। এই ফাঁকা মাঠের চারা হলো-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।'

আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর শিখানো এই আমল আমাদের করা উচিত। সালাতুত তাসবীহ আদায়ের মাধ্যমে এই দুআ বেশি বেশি পাঠের সুযোগ হয়।

রাসূল ﷺ কে জাহান্নামের শাস্তি দেখানো হলো। রাসূল ﷺ এমন কতক লোক দেখলেন যাদের নাসিকা তামার তৈরি, তারা নিজেদের নখ দ্বারা স্বীয় বক্ষ ও অবয়ব খামচাচ্ছিল। তিনি এর হেতু জানতে চাইলে জিবরাইল (আ.) বললেন, এরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত অর্থাৎ গীবত এবং অপরের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান করত। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবূ দাউদ হাদীসখানা আনাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন।

আরেক সম্প্রদায়ের লোকদের অতিক্রমকালে দেখা গেল প্রস্তরাঘাতে তাদের মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। অত:পর তাদের মাথা আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য নিরন্তর চালু ছিল। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? জিবরাইল (আ.) বললেন, ফরয নামাযের ক্ষেত্রে এরা গড়িমসি করত।

অতঃপর আরো কিছু লোক দেখা গেল, তাদের সম্মুখে এক পাত্রে রান্না করা গোশত এবং অপর পাত্রে কাঁচা ও পচা গোশত রক্ষিত ছিল। তারা রান্নাকৃত গোশতের পরিবর্তে কাঁচা ও পচা গোশত ভক্ষণ করছিল। হুযূর ﷺ জানতে চাইলেন তারা কারা? জিবরাইল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের মধ্যে ঐ সকল পুরুষ যারা বৈধ ও সতী স্বীয় পত্নী রেখে অপর নারীর সাথে রাত্রি যাপন করত। আর এদের মধ্যে যারা মহিলা তারা আপনার উম্মতের ঐ সকল রমণী যারা পবিত্র স্বামীকে ছেড়ে ব্যভিচারী পুরুষের সাথে রাত কাটাত।

রাসূল ﷺ এরপর দেখলেন, কিছু লোকের জিহ্বা ও ঠোঁট কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। কাটা শেষ হলে আবার তা আগের মতো হয়ে যায়। পুনরায় কাটা হয়। এভাবে এ কাজ অব্যাহত ছিল। হুযূর ﷺ তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। জিবরাইল (আ.) বললেন, এরা ঐ সব বক্তা যারা অপরকে আমল করতে বলত অথচ নিজেরা আমল করত না। (খাসায়েসুল কুবরা)

এরপর রাসূল ﷺ সিদরাতুল মুনতাহায় গেলেন। জিবরাইল (আ.) সিদরাতুল মুনতাহায় থেমে গেলেন। সেখান থেকে রাসূল ﷺ একা একা ঊর্ধ্বলোক সফর করেন। যখন তিনি আল্লাহর জালালিয়াতের সামনে উপস্থিত তখন পড়লেন, التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত ত্বাইয়িবাত"।

আল্লাহ তাআলা তার নবীকে সালাম দিলেন, **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ**

"আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"।

আমাদের জন্য সে সালামকে ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি নামাযে প্রিয়নবী ﷺ কে সালাম না দেই তাহলে আমাদের নামায সহীহ হবে না।

আল্লাহ পাকের সালাম রাসূল ﷺ শুধুমাত্র নিজের জন্য নিতে পারতেন কিন্তু মহান আল্লাহর সালামের সৌভাগ্যে তার নেককার উম্মতকে শামিল করলেন। তাই তিনি বললেন, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِين

"আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন"।

তাঁদের সেই কথোপকথন শুনে আকাশবাসী ফিরিশতারা বলে উঠলেন, **أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**

"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু"।

এ বর্ণনা তাফসীরে কুরতুবী এর মধ্যে রয়েছে।

মিরাজ রজনীতে রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না এ সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন। সূরা নাজমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى** (সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা)

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, **قد رآه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم** রাসূল ﷺ আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন। (শিফা)

তিনি আরো বলেন, **أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم**

"(মহান আল্লাহর সাথে) ইবরাহীম (আ.) এর বন্ধুত্ব, মূসা (আ.) এর কথা বলা এবং মুহাম্মদ ﷺ এর দীদার হওয়াতে তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করো?"

মিরাজ রাতে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উপহার হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিলেন। প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত ছিল। তারপরে হযরত মূসা (আ.) এর অনুরোধে রাসূল ﷺ নামায কমানোর আবেদন করেন। এভাবে বার বার আল্লাহর দরবারে গিয়ে অবশেষে ৫ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন যারা এই ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে তাদেরকে ৫০ ওয়াক্ত নামাযের সাওয়াব দেওয়া হবে।

সকল নবীর মিরাজ হয়েছে যমীনে, আমাদের নবীর মিরাজ হয়েছে আরশে মুআল্লায়। এর কারণ হিসেবে কোনো কোনো কিতাবে বলা হয় আকাশবাসী মহান আল্লাহর কাছে তার প্রিয় হাবীব ﷺ এর ফায়য ও বারকাত লাভের আবেদন করে। আল্লাহ তাআলা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাসূল ﷺ কে মিরাজে নেন।

তাছাড়া আরেকটি কারণ হতে পারে আমরা জান্নাত-জাহান্নাম, আখিরাত ইত্যাদির সাক্ষী দেই প্রিয় নবী ﷺ এর কথার ভিত্তিতে। তিনি বলেছেন এগুলো সত্য তাই আমরা বিশ্বাস করি। কেউ যদি প্রশ্ন করে নবী ﷺ কি এগুলো স্বচক্ষে দেখেছেন? কেউ যেন এই প্রশ্নের সুযোগ না পায় সেজন্য আল্লাহ তাআলা তার হাবীবকে স্বশরীরে মিরাজে নিয়ে দেখিয়ে এনেছেন। আর প্রিয়নবী ﷺ এর সত্যবাদিতার ব্যাপারে কাফিররাও নিঃসন্দেহ ছিল। নবুওয়াত পূর্ব যুগেই তারা তাকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছে।

মিরাজ থেকে ফিরে এসে রাসূল ﷺ যখন মিরাজের কথা বর্ণনা করলেন তখন কাফিররা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলো। কেননা তারা জানত মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস যেতে হলে একমাস লাগে। সেখানে তিনি রাতের সামান্যতম সময়ে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন। এটা অসম্ভব। তারা আবূ বকর (রা.) কে রাস্তায় পেয়ে বলল তোমার নবী এরকম বলেছেন। আবূ বকর (রা.) এটা শুনে বললেন আল্লাহর কসম! যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন তাহলে আমি অবশ্যই বিশ্বাস করব। এদিন থেকে আবূ বকর (রা.) সিদ্দীক উপাধি লাভ করলেন। কাফিররা রাসূল ﷺ এর কথা প্রমাণের জন্য রাসূল ﷺ কে এসে প্রশ্ন করলো, আপনি তো বাইতুল মুকাদ্দাস গেছেন, তাহলে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ আমাদেরকে দিন। রাসূল ﷺ বলেন আমি এই দিন সবচেয়ে বেশি পেরেশান হয়েছি। তারপর বলেন,

فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه

-আল্লাহ তাআলা আমার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরালেন। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস দেখে দেখে তার বিবরণ দিয়েছি।

তারপর তারা আরো প্রমাণ চাইলো। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের এক কাফেলা বাণিজ্যে গেছে। আমি তাদেরকে রাস্তায় দেখেছি তারা তাদের উট হারিয়ে ফেলেছে। পরবর্তীতে তা খুঁজে পেয়েছে। তারা তিন দিন পর মক্কায় আসবে।

এখানে বিক্ষিপ্তভাবে মিরাজের রাতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কিছু আলোকপাত করা হলো। এ বিষয়ে যারা বিস্তারিত জানতে চান তারা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর খাসায়িসুল কুবরা, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর মুনতাখাবুস সিয়ার দেখতে পারেন।

শবে বরাত : করণীয় ও বর্জনীয়

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

শবে বরাত এক মহিমান্বিত রজনী। এ রজনীতে দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা প্রদানে অনুগৃহীত করেন। এ রাতে আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষণা আসেঃ কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোনো রিযক প্রার্থনাকারী আছ কি? আমি তাকে রিযক দান করব। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি? আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করব। এমনি ঘোষণা সারা রাত চলতে থাকে।

শবে বরাত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن–

-আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক অথবা হিংসা-বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান (অখণ্ড) পৃষ্ঠাঃ ১৫১৪, হাদীস নং" ৫৬৬৫)

এ হাদীসটি সহীহ। লা-মাযহাবীদের মান্যবর ইমাম শায়খ নাসিরউদ্দিন আলবানীও এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তিনি তার 'সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা' গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করত লিখেছেন-

حديث صحيح ، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا و هم معاذ ابن جبل و أبو ثعلبة الخشني و عبد الله بن عمرو و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة و أبي بكر الصديق و عوف ابن مالك و عائشة –

-হাদীসটি সহীহ। একদল সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে, যা একে অন্যকে শক্তিশালী করে। এ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম হলেন- ১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ২. আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা.) ৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ৪. আবূ মূসা আল আশআরী (রা.) ৫. আবূ হুরাইরাহ (রা.) ৬. আবূ বকর (রা.) ৭. আউফ ইবনে মালিক (রা.) ৮. হযরত আয়িশাহ (রা.)। (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৫, হাদীস নং ১১৪৪)

হযরত আবূ সা'লাবা আল খুশানী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمن و يملي للكافرين و يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه–

-আল্লাহ তাআলা শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। (বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لإثنين مشاحن وقاتل نفس–

-শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে (শবে বরাত) আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে দুপ্রকার ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না। ১. হিংসা বিদ্বেষপোষণকারী, ২. মানুষ হত্যাকারী (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২১৬)।

বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শবে বরাত এক মহিমান্বিত রজনী।

শবে বরাতে আমাদের করণীয়

শবে বরাতে রাসূলে পাক ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সলফে সালিহীনের বিভিন্ন আমলের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁদের অনুসরণে শবে বরাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইবাদত বন্দেগিতে মনোনিবেশ করতে পারি। যেমন :

(ক) রাতে জাগ্রত থাকা :

ইবাদত বন্দেগির উদ্দেশ্যে শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে জাগ্রত থাকা মুস্তাহাব। আরব-অনারবে স্বীকৃত হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফতওয়ার কিতাব ফতওয়ায়ে শামী'তে শবে বরাতে জাগ্রত থাকাকে মানদুব তথা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। (ফতওয়ায়ে শামী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫-২৭)

মারাকিল ফালাহ গ্রন্থে শবে বরাতে জাগ্রত থাকাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। পাশাপাশি জাগ্রত থাকার পদ্ধতি কী হতে পারে এ বিষয়ে বলা হয়েছে-

معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم–

-শবে বরাতে জাগ্রত থাকার অর্থ হলো, রাতের অধিক সময় আনুগত্যমূলক কাজে ব্যস্ত থাকা। কেউ কেউ বলেন, রাতের কিছু অংশ কুরআন তিলাওয়াত করবে অথবা তিলাওয়াত শুনবে, অথবা হাদীস পাঠ করবে কিংবা পাঠ শুনবে, তাসবীহ-তাহলীল করবে অথবা দরুদ শরীফ পড়বে। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, **فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي** পৃষ্ঠা ১৭৪)

(খ) কবর যিয়ারত করা এবং মৃত আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা :

শবে বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশেষ আমলের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি এ রাতে জান্নাতুল বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন এবং মৃত মুমিনদের জন্য দুআ-ইস্তিগফার করেছেন। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেছেন-

ومما ثبت من فعله صلّى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة ليلة النصف من شعبان ليستغفر المؤمنين والمؤمنات والشهداء–

অর্থাৎ শবে বরাতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের মধ্যে

সাবিত আছে যে, তিনি মুমিন নারী-পুরুষ ও শহীদদের মাগফিরাত কামনার জন্য কবরস্থানে গমন করেছেন। (মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ ফী আয়্যামিস সানাহ, শাহরু শা'বান, আল মাকালাতুস সালিসাহ)

সুতরাং এ রাতে কবরস্থান যিয়ারত করা, মৃত আত্মীয় স্বজন, পিতা-মাতা ও মুসলমানদের জন্য দুআ করা এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করা উত্তম কাজ।

(গ) আল্লাহর দরবারে দুআ করা :

হাদীস শরীফে আছে, এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসা বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, এ রাতে আল্লাহ পাক এই বলে আহ্বান করেন, তোমাদের মধ্যে কি কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোনো প্রার্থনাকারী কি আছে? আমি তার চাহিদা পূর্ণ করে দেব। রাসূল ﷺ বলেন, যেই চাইবে তাকে দান করা হবে, কেবল ব্যভিচারী ও মুশরিক ব্যতীত।

সুতরাং এ রাতে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে নিজের মাগফিরাতের জন্য দুআ করা উচিত। বিশেষ করে ঐসব গুনাহের জন্য ইস্তিগফার ও তওবা করা উচিত, যেগুলো আল্লাহর কৃপা দৃষ্টি লাভের অন্তরায়।

(ঘ) নফল নামায আদায় করা :

এ রাতের করণীয় আমলের অন্যতম হলো বেশি বেশি করে নফল নামায আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সিজদা সহকারে এ রাতের দীর্ঘ সময় নামাযে অতিবাহিত করেছেন। সলফে সালিহীনগণ নামাযের জন্য এ রাতকে খাস করে নিতেন। তবে শবে বরাতের নামাযের জন্য নির্ধারিত কোনো নিয়ম নেই। নিজের মনের চাহিদা অনুযায়ী যত রাকাআত ইচ্ছা পড়তে পারেন, যে কোনো সূরা দিয়ে পড়তে পারেন। এ বিষয়ে কোনো শর্ত নেই। দীর্ঘ নামায পড়তে চাইলে এ রাতে সালাতুত তাসবীহ পড়া যেতে পারে।

সালাতুত তাসবীহ-এর নিয়ম নিম্নরূপ :

- চার রাকাআত সুন্নত নামাযের নিয়ত করবেন।
- তাকবীরে তাহরীমার পর সানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা...) পাঠ করবেন।
- তারপর নিচের তাসবীহ ১৫ বার পাঠ করবেন-
  سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ولا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
- তারপর আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।
- তারপর এর সাথে অন্য যে কোনো সূরা মিলিয়ে পড়বেন।
- এরপর রুকূতে যাওয়ার আগে ১০ বার উপরের তাসবীহ পাঠ করবেন।
- তারপর রুকূতে গিয়ে রুকূর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়ার পর ১০ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন।
- রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' পড়ার পর ১০ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন।
- তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদাহ'র তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।
- তারপর দুই সিজদার মাঝখানে বৈঠকের তাসবীহ পাঠ করে ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।
- তারপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদাহ'র তাসবীহ পাঠ করে ঐ তাসবীহ ১০ বার পাঠ করবেন।

এভাবে চার রাকাআত নামায পড়বেন। এতে প্রতি রাকাআতে ৭৫ বার করে চার রাকাআতে মোট ৩০০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-২২৩)

শায়খ ইবনে তায়মিয়া শা'বানের মধ্যবর্তী রাত তথা শবে বরাতে নামায আদায় করাকে উত্তম বলেছেন। তাঁর বক্তব্য হলো-

إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن –

-যদি কোনো ব্যক্তি শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে একাকী অথবা বিশেষ জামাআতে নামায আদায় করে, যেমন একদল সলফে সালিহীন করতেন, তাহলে এটা উত্তম। (আল ফাতাওয়া আল কুবরা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬২)

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো কিতাবে শা'বানের পনের তারিখ রাতের জন্য বিশেষ নফল নামাযের কথা বলা হয়েছে। যেমন আলফিয়া নামায। এ নামাযের পদ্ধতি হলো- একশত রাকাআত নামায এভাবে পড়তে হয়, যার প্রত্যেক রাকাআতে দশবার করে সূরা ইখলাস পড়তে হবে। তবে এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইবনুল জাওযী একশ রাকাআত নামায সম্পর্কিত বর্ণনাকে মাওযূ বলেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) শবে বরাতের বিশেষ নামায সম্পর্কিত সকল বর্ণনাকে মাওযূ বলেছেন।

(ঙ) কুরআন তিলাওয়াত ও শরীআত সম্মত অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি করা

উপরোক্ত আমলসমূহ ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, দান-খয়রাতসহ শরীআতসম্মত অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে এ রাত অতিবাহিত করা সওয়াবের কাজ। কেননা এসব আমল সব সময়েই উত্তম আমল হিসেবে বিবেচিত।

(চ) ১৫ শা'বান দিনে রোযা রাখা

১৫ শা'বান দিনে রোযা রাখা একটি তাৎপর্যপূর্ণ আমল। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها –

-যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে তখন তোমরা রাত জেগে সালাত আদায় করবে আর দিনে সিয়াম পালন করবে। (ইবনে মাজাহ, ১ খণ্ড باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان, পৃষ্ঠা- ৪৪৪)

শবে বরাতে বর্জনীয় কাজসমূহ

শা'বান মাস ও পবিত্র রজনী শবে বরাত মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের এক অনন্য সুযোগ। সুতরাং এ সময়ে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যা আল্লাহর রহমত লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শবে বরাত নিয়ে সমাজে কিছু বিদআত ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে :

১. ঘর-বাড়ি, দোকান, মসজিদ ও রাস্তা-ঘাটে আলোকসজ্জা করা।
২. বিনা প্রয়োজনে মোমবাতি কিংবা অন্য কোনো প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা।
৩. আতশবাজি করা।
৪. পটকা ফোটানো।
৫. মাজার ও কবরস্থানে মেলা বসানো ইত্যাদি।

এ সকল বিদআত ও কুসংস্কার থেকে আমাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব

মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম

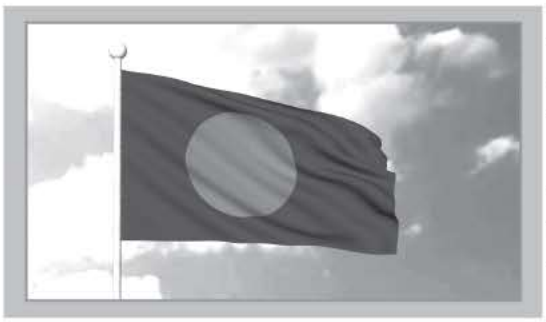

ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মহানায়ক রুশোর একটি কথা দিয়ে শুরু করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাকে সর্বত্র শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।' সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে মানুষকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। স্বভাবগতভাবেই মানুষ একটি স্বাধীনচেতা প্রাণি। পরাধীন বা অন্যের অধীন থাকতে চায় না, স্বাধীন থাকতে চায়। প্রয়োজনে এর জন্য জীবনও দিয়ে দেয়। যে স্বাধীনতার জন্য মানুষের স্বপ্ন, সাধ, সংগ্রাম ও সাধনার অন্ত নেই। আসলে সে স্বাধীনতা নামের এ বস্তুটির সত্যিকার পরিচয় কী? কেনইবা সেই বিস্ময়কর বস্তুকে লক্ষ কোটি প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়? যার জন্য ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘটে অন্তহীন ফ্যাসাদ।

স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা বা নিজের অধীনতা, পরাধীনতা বা অন্য কারো অধীনতা নয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসারের মতে, 'যে স্বাধীনতা বলতে নিজের খুশিমতো কাজ করাকে বুঝায়, যদি উক্ত কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগে বাধা সৃষ্টি না করে।' আধুনিক পণ্ডিতদের ভাষায় স্বাধীনতা সেই বস্তুটির নাম, যা অর্জিত হলে মানুষ অন্যের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে এই পৃথিবীতে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আত্মবিকাশ ও আত্মোন্নতি করতে পারে, নিজেই নিজ দেশ ও সম্পদের মালিক হতে পারে, সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পারে, কাঙ্ক্ষিত সুখ ভোগ করতে পারে। পাশ্চাত্য লেখকদের মতে নাগরিক স্বাধীনতা দুই প্রকার: ১. সামাজিক: যার মাধ্যমে মানুষ দমনমূলক বাধ্যবাধকতার পরিসমাপ্তি এবং প্রাকৃতিক ও নাগরিক অধিকার অর্জন করে। ২. রাজনৈতিক: যার ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিক নিজের সরকার গঠন এবং তাতে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের অধিকার পায়। মানুষ স্বাধীনতার মাধ্যমে নিজ মনের কামনা-বাসনাকে বাস্তবায়িত করতে চায়। জীবনের উন্নতি ও বিকাশ চায়।

এ ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ মানুষকে তার প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সৃষ্টির সেরা রূপ সৌন্দর্য, দিয়েছেন জগতে তার অধিকার, উন্মুক্ত করেছেন তার জন্য সকল নিআমতের ভাণ্ডার এবং বরাদ্দ করেছেন জ্ঞান ও অধিকার। যারা এ জ্ঞান শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অধীন বিশ্বকে জয় করে নেওয়ার সংগ্রাম সাধনা করে, স্বাধীনতা তাদেরই জন্য।

আল্লাহ পাক মানুষকে জন্মগতভাবে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। তাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে মানুষ পরাধীন থাকতে চায় না। ইসলাম ধর্মও এরকম পরাধীনতাকে সমর্থন করে না। ইসলামে পরাধীনতাকে 'আজাবুম মুহীন' বা কঠোর আজাব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য অনেক সাধনা করেছেন। এমনকি সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন এবং মদীনাকে একটি স্বাধীন ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে গঠন করেছিলেন। এই স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে রাসূল ﷺ তার দাওয়াতী মিশনকে আরো তীব্র গতিতে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে মক্কা বিজিত হয়। যার মধ্যদিয়ে এ স্বাধীনতার বিস্তৃতি ও পরিধি আরো বৃদ্ধি পায়। রাসূল ﷺ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র মদীনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। এর ফলে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব হয়। মদীনা রাষ্ট্র পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো সময়, যে কোনো কালের জন্য শান্তি, শৃঙ্খলা, মানবতা ও উদারতার প্রতীক হয়ে থাকবে।

মাতৃভূমিকে ভালোবাসা এবং এর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ঈমানের অংশ। আরবীতে বলা হয় 'হুব্বুল ওয়াতানি মিনাল ঈমান' অর্থাৎ দেশপ্রেম ঈমানের অংশ। রাসূল ﷺ তার স্বদেশকে ভালোবাসতেন এবং দেশের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক মানুষের উচিত দেশকে ভালোবাসা। যে লোক দেশকে ভালোবাসে না সে প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়।'

পরাধীনরা তাদের স্বীয় মাতৃভূমি উদ্ধার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবে এটাই ইসলামের বিধান। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন 'এসব লোকদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যারা (শত্রু কর্তৃক) আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আর নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদের জয়যুক্ত করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। মাতৃভূমি থেকে তাদের অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে এজন্য যে, তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ। (সূরা হজ্জ, আয়াত-৩৯)

স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে ইসলামেও জোর তাগিদ রয়েছে। রাসূল ﷺ মদীনা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করেছেন, এমনকি অনেক যুদ্ধও করেছেন। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পরও কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান মক্কায় ছিল। যাদের উপর মক্কার কাফির মুশরিকরা চালিয়েছিল অত্যাচারের স্ট্রিমরোলার। এদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাকে উৎসাহিত করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, 'তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছ না

সে সকল দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য। যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এই জনপদ থেকে রেহাই দাও যার অধিবাসী যালিম। তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সহায় করো।' (সূরা নিসা, আয়াত-৭৫) ইসলাম শুধু স্বাধীনতা অর্জনের প্রতি উৎসাহিতই করে না বরং স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষায় জীবনদানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 'যারা দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে তাদের জন্য চির শান্তির জান্নাত।'

রাসূল ﷺ অন্যত্র বলেছেন, 'একদিন ও একরাতের প্রহরা ক্রমাগত এক মাসের নফল রোযা এবং সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম।' (মুসলিম শরীফ)

যখন অন্য কোনো দেশ বা জাতি নিজের দেশের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তখন দেশের সকল জনগণের উপর দেশ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা ফরয হয়ে যায় এবং তখন জাতীয়তাবোধও প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। আর এর ফলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে মানুষ অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্বীন ইসলাম ও মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দেয়। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৪)

বাংলাদেশসহ বিশ্বের ইতিহাসে এমনি অনেক বীর সেনানী রয়েছেন। যারা দেশ রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। জাতি তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে। বাংলাদেশ নামক যে ভূখণ্ডটিতে আমরা বসবাস করছি সেটাও স্বাধীনতা অর্জন করতে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ১৬ ডিসেম্বর তা শেষ হয়। এ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছে তারাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। ইসলামের দৃষ্টিতে তারা শহীদ এবং জাতি তাদের কাছে চির ঋণী। আল্লাহ পাকও তাদের চির শান্তির স্থান জান্নাতে আবাস দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- 'শহীদের রূহগুলো চির শান্তির স্থান জান্নাতে ভ্রমণ করতে থাকে এবং সেখানকার ফল ও নিআমতসমূহ আহার করে থাকে।'

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এখনো চলছে। কারণ অর্থনীতিতে আমরা এখনো আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি, আমাদের রাজনীতিও বিদেশিদের প্রভাবমুক্ত নয়, সুস্থ গণতন্ত্র চর্চার পরিবেশ স্বাধীনতার পর থেকে বেশ কিছু সময় ছিল না। তাই বলা হয়ে থাকে 'স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে রক্ষা করা কঠিন।' আমাদের সেই কঠিন কাজটুকু করার দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বিদেশি প্রভাবমুক্ত আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনী তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে

E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর **গ্রাহক** হওয়ার জন্য **আবেদন?**

পরওয়ানার অনুকূলে আপনার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০ (বিকাশ)

এ পথ সূফীদের নয়

মারজান আহমদ চৌধুরী

কিছুদিন পূর্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "ইসলাম তো দুটি। একটি মোল্লাদের ইসলাম, আরেকটি সূফীদের।"

এমন নয় যে, কথাটি আমরা প্রথমবার শুনেছি। এমনও নয় যে, কথাটি শাহরিয়ার কবিরের মস্তিষ্কজাত। বরং বহু বছর ধরে এ তত্ত্বটি পশ্চিমা ইসলাম-বিদ্বেষী (Islamophobic) নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে স্থান পেয়ে আসছে। পশ্চিমা যুদ্ধবাজ নেতারা এরকম যুক্তি দিয়ে বারবার মুসলিম বিশ্বে হামলা করাকে বৈধতা দিতে চেয়েছেন। ৯/১১ দুর্ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক হামলার প্রারম্ভে মার্কিন কংগ্রেসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মন্তব্য ছিল প্রায় এরকমই। তিনি দাবি করেছিলেন, "আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি না। আমাদের যুদ্ধ মৌলবাদী ইসলামের বিরুদ্ধে।" তারা বারবার বুঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম দুটি। এক ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর আর দশটি ধর্মমতের মতো একটি Religious Tradition তথা প্রথাসর্বস্ব ধর্মমত, যেখানে কিছু ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ব্যক্তিগত ধর্মকর্ম এবং ব্যক্তিগত বা একান্ত পারিবারিক পরিমণ্ডলে কিছু প্রথা পরিপালন করার সুযোগ রয়েছে। ইসলামের এ ধরনের ব্যাখ্যা পশ্চিমাদের কাছে অনেকাংশেই গ্রহণযোগ্য। রামাদান মাসে হোয়াইট হাউজে ইফতার পার্টি আয়োজন করার মাধ্যমে এ প্রথা সর্বস্ব ইসলামকে তাঁরা কিঞ্চিত পৃষ্ঠপোষকতাও প্রদান করেন।

পশ্চিমাদের কাছে ইসলামের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মকর্মের বাইরের অংশ। ব্যক্তিগত ধর্মকর্মের বাইরে ইসলামের অন্য যে কোনো ভূমিকাকে তারা 'মৌলবাদী ইসলাম' নামে আখ্যায়িত করেন। আবার কখনো নাম দেওয়া হয় 'রাজনৈতিক ইসলাম'। এ নামগুলো তাদেরই দেওয়া। সুবিধামতো এসব পরিভাষার যথেচ্ছা ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানদের যেকোনো অধিকার আন্দোলনের সাথে Political Islam কিংবা Fundamental Islam এর লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়।

এতটুকু পর্যন্ত হজম করা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য নয়। যাদের চিরন্তন লড়াই ইসলামের বিপক্ষে, তাদের কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করাও নেহায়েত ছেলেমানুষি। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ইদানিং ইসলাম-বিদ্বেষীদের পছন্দনীয় ইসলামকে নতুন একটি নাম প্রদান করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে 'সূফীবাদী ইসলাম'। ২০১৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সূফী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানকালে বলেছেন, "ভারতকে সূফীবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা হবে।" তিনি সূফীবাদী ইসলামের মাধ্যমে মৌলবাদী ইসলামকে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। VOA (ভয়েস অব আমেরিকা) এর তথ্য অনুযায়ী, এ সম্মেলন আয়োজন করার পেছনে কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির বড় ভূমিকা ছিল।

বলা বাহুল্য, ইসলাম-বিদ্বেষী নেতা ও পণ্ডিতদের মুখে ইসলামের যে বিভাজন শোনা যায়, তা ইসলামের নিজস্ব ব্যাখ্যা নয়। এসব তাদেরই আবিষ্কার। বস্তুত ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চায়, সেটি তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৫)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ কেবল ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নয়; বরং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। যার মধ্যে রয়েছে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধান, আইন প্রণয়নের মূলনীতি, অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ, পারস্পরিক লেনদেন, বিচারিক নীতিমালা, সামরিক কর্মপন্থা, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশনা তথা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র। সূরা ইউসুফে যখন دِينِ الْمَلِكِ বা রাজার দ্বীন বলা হয়েছে, তখন এর দ্বারা 'রাজার ধর্মবিশ্বাস' উদ্দেশ্য করা হয়নি। উদ্দেশ্য করা হয়েছে রাজার রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানকে। রাসূলুল্লাহ ব কেবল মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পরিবর্তন করেননি; বরং জীবন যাপনের পুরো পদ্ধতিকেই নতুনভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। কারও ধর্মবিশ্বাস পাল্টানোর জন্য আল্লাহর নবী তরবারি হাতে নেননি। তরবারি হাতে নিয়েছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইসলাম একটি Organic Whole বা জৈবিক একক, যার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবিচ্ছেদ্য। একটি অঙ্গকেও কর্তন করলে সেটি আর পরিপূর্ণ থাকে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? অতএব তোমাদের যারা এমন করে, তাদের জন্য পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও

অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।" (সূরা বাকারা, আয়াত- ৮৫)

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিদ্বেষীদের মুখে সূফীবাদী ইসলাম বনাম মৌলবাদী ইসলামের পার্থক্যের বয়ান শুনার পর এখন দেশীয় উনপাঁজুরে বুদ্ধিজীবীদের মুখেও এ বয়ান শুনতে হচ্ছে। দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতাকে ধ্বংস করে কিছু নির্জীব প্রথা-পার্বণকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। আর এজন্য 'সূফীবাদ' নামক পরিভাষাটি এখন তাদের কাছে তুরুপের তাস। কারণ তথাকথিত সূফীবাদের ঠিকাদাররা বর্তমানে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন, যেখানে তাদের মধ্যে নববী আদর্শের লেশমাত্র বাকি নেই। নেই তাকওয়া, নেই ইলম, নেই দ্বীনী দাওয়াত, নেই তালীম-তারবিয়াত, নেই বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নেই তাকবীর দেওয়ার হিম্মাত, নেই জিহাদ, আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টা তো নেই-ই। আছে শুধু ব্যক্তিপরস্তি, কবরপরস্তি, অসাড়তা, নির্জীবতা, শিরকী প্রথা-পার্বণ, শিরকী ভক্তি-কুর্নিশ, গা বাঁচানো আষাঢ়ে যুক্তি, দ্বীনকে বিক্রি করে পেট চালানোর ধান্ধা। এ জন্য আজ ইসলাম-বিদ্বেষীদের মনে এসব তাগুতের ক্রীড়নকদের ব্যাপারে আশা জন্মেছে।

অথচ তাসাওউফ তথা রূহানিয়্যাত দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ছিল তাযকিয়ায়ে নাফস তথা আত্মার পরিশুদ্ধি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত।" (সূরা জুমুআ, আয়াত- ২)

আল্লাহর মারিফাত অর্জন ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার যে দীক্ষা আল্লাহর নবী ﷺ প্রদান করেছিলেন, আল্লাহর তরে জানমালের নযরানা পেশ করে সাহাবায়ে কিরাম সে পরিশ্রমের মান রেখেছেন। যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চোখে পানি এসেছিল, সাহাবায়ে কিরাম শরীরের ঘাম ঝরিয়ে সে স্বপ্নকে সার্থক করেছেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক ফোঁটা ঘাম ঝরেছিল, সাহাবায়ে কিরাম সেখানে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে সেই ঘামের ফোঁটার হক আদায় করেছেন। এই ছিল তাঁদের আত্মশুদ্ধির নমুনা, এই ছিল তাঁদের তাকওয়া ও হুব্বে রাসূলের উদাহরণ, এই ছিল দ্বীনের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার।

সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগের মহিমা ইতিহাসে রঙ ছড়িয়েছে। বনূ উমাইয়ার হাতে খিলাফত ভেঙ্গে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রেক্ষিতে জোরালো কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করেছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রা.), হুসাইন ইবনে আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) প্রমুখ সাহাবীরা। ইয়াযীদের দুঃশাসন থেকে ইসলামী খিলাফতকে রক্ষা করার জন্য ইমাম হুসাইন (রা.)সহ আলে-মুহাম্মাদের ﷺ ১৯ জন সূর্যসন্তান কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন। আব্বাসী শাসনামলে খলীফা মনসুর ইমাম আবূ হানীফাকে তাঁর অধীনে প্রধান বিচারপতির পদ অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, যেন ইমাম আবূ হানীফার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করা যায়। কিন্তু জালিমের অধীনে উচ্চপদস্থ চাকরি করার চেয়ে ইমাম আবূ হানীফা কারাগারে বন্দী অবস্থায় নির্যাতনকেও শ্রেয় মনে করেছেন। একই শাসকের বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান করে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ইমাম মালিক। মুতাযিলা আকীদায় প্রভাবিত হয়ে আব্বাসী খলীফা মামুন যখন কুরআন কারীমকে 'আল্লাহর কালাম' হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন, তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্ধকার কুঠুরিতে বছরের পর বছর চরম নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কালামের ইয্যতের জন্য লড়াই করা থেকে ক্ষান্ত হননি।

একই পথে হেটেছেন পরবর্তী আউলিয়া-সালিহীন। ১১৮৭ সালে ক্রুসেডারদের হাত থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করে এনেছিলেন তাসাওউফের খানকায় বেড়ে ওঠা বীর মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী। তাঁর ডাকে সে অভিযানে যোগ দেওয়া মুজাহিদীনের একটি বড় অংশ ছিলেন ইমাম সায়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানীর মুরিদীন-মুহিব্বীন। ইমাম শাযুলী জিহাদ করেছেন ফরাসিদের বিরুদ্ধে। ১১৯১-৯২ সালে তরাইনের যুদ্ধে সামন্ত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে ভারতের বুকে ইসলামকে যিনি একটি শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী। ১৩০৪ সালে তরফ রাজ্যের রাজা গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালারের বিজয় অভিযানের পেছনে অনুপ্রেরণার খুঁটি ছিলেন তাঁর মুরশিদ সুলতানে সিলেট শাহজালাল ইয়ামনী (র.)। মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের তৈরি দ্বীনে এলাহী নামক নব্য আবিষ্কৃত ধর্মের বিদায়ঘণ্টা বেজেছিল মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইমাম আহমদ সিরহিন্দীর হাতে। আল্লাহর এ মহান ওলীর ইসলাহী কার্যক্রম ও জিহাদী চেতনা ভারতের যমীন থেকে দ্বীনে এলাহীর নামকে চিরতরে মুছে দিয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদের ফতওয়া জারী করেছেন শাহ আবদুল আযীয দেহলভী। তাঁর খলীফা সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী মাঠে নেমেছিলেন মুরশিদের ফতওয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য। শিখ, মারাঠা ও ইংরেজদের ত্রিমুখী শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি ভারতের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে শিখদের সাথে জিহাদরত অবস্থায় বালাকোটের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন আমীরুল মুসলিমীন সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী। সেই ১৮৩১ সাল থেকে আজ অবধি ভারতীয় উপমহাদেশে যত ইসলামী আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে, সবগুলোই মহান বালাকোট আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। বালাকোট দেখিয়ে দিয়েছে, জিহাদের মানে কী। পরবর্তীতে সায়্যিদ আহমদের সংগ্রামী সাধনাকে সার্থক করেছেন তাঁর খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ও মীর নিসার আলী তিতুমীর।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের বাঁশেরকেল্লার প্রতিরোধ আজও উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে আন্দোলিত করে। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন শায়খ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী এবং তদ্বীয় খলীফা শায়খ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী।

রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী সীসাঢালা প্রাচীরের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দাগেস্তানের সিংহ ইমাম শামিল। ইসলাহী কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্বিধাবিভক্ত ককেশীয় মুসলমানদেরকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এরপর জার সম্রাটের নাকের নিচে ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত, দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি দাগেস্তানে ইসলামী খেলাফত পরিচালনা করেছেন। বারবার আক্রমণ করেও তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি রাশিয়ানরা। একটি যুদ্ধে তাঁর পাঁজরের তিনটি হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। আহত অবস্থায়ও ঘোড়ায় চড়ে তিন সারি রাশিয়ান সৈন্যের মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যান ইমাম শামিল। শেষমেশ যখন গ্রেফতার হয়েছিলেন, তখনও তাঁকে কারাগারে বন্দী করে রাখার সাহস পায়নি জার সম্রাটের বাহিনী। ১৮৭১ সালে ইমাম শামিল মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে চিরনিদ্রায় শায়িত নকশবন্দী সিলসিলার এ মহান মুজাহিদের অমর বীরত্বগাথা আজও ককেশাস পর্বতমালার বাঁকে বাঁকে গুঞ্জিত হয়।

আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন আমির সায়্যিদ আবদুল কাদির আল-জাযাইরী। অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তির মতো ফ্রান্স যখন সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা হিসেবে ভূমধ্যসাগরের বিপরীত তীরে আলজেরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়, তখন আমির আবদুল কাদির প্রথম ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির গতিরোধ করেন। দ্বীনী দাওয়াতের মাধ্যমে মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি আলজেরিয়ার ছোট-বড় সকল গোত্রকে একত্রিত করেন এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী কিছু অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র আলজেরিয়ায় নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে দমনের জন্য একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেও ব্যর্থ হয় ফরাসি বাহিনী। ১৮৩৭ সালে আলজেরিয়ায় ফরাসি বাহিনী ও আমির আবদুল কাদিরের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ফরাসিদের দ্বারা শান্তিচুক্তি লঙ্ঘনের পর তিনি পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। সাজ-সরঞ্জাম কম হলেও দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত আমীর আব্দুল কাদির তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে বন্দী করা হয়। জীবনের শেষদিকে তিনি উসমানী খিলাফতের অধীনে সিরিয়ায় দ্বীনের খিদমতে সময় পার করেছেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেছেন।

লিবিয়ায় ইতালীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন মরুর সিংহ উমর আল-মুখতার। পেশাগতভাবে কুরআনের শিক্ষক হলেও মুখতার মরুভূমিতে যুদ্ধকৌশলের ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন। তাঁর গেরিলা বাহিনী দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা ও সৈন্যবহরের ওপর আক্রমণ চালায় এবং যোগাযোগ ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বারবার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেওয়া হলেও মুখতার তা ফিরিয়ে দেন। ১৯৩১ সালে আহত অবস্থায় তাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ফাসিতে ঝুলিয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মুখভরা হাসি নিয়ে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন সূফী তরীকার এ মহান মুজাহিদ।

উপরিউক্ত মুজাহিদদের সময় ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও তাঁদের মধ্যে একটি বড় সাদৃশ্য ছিল। তাঁরা সবাই ছিলেন আলিমে দ্বীন, সূফী। তাসাওউফ তাঁদের সংগ্রামের সোপান হয়েছিল। তাঁদের আত্মশুদ্ধি তাগুতের লংমার্চকে থামিয়ে দিয়েছিল। নিজেদের দেহ-প্রাণকে জ্বালানি বানিয়ে তাঁরা আল্লাহর বাতিকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। একইভাবে এ বাংলাদেশে যখনই ইসলাম-বিদ্বেষীদের চক্রান্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন এ দেশের উলামা-মাশায়েখ প্রতিবাদী হয়ে রাস্তায় নেমেছেন, প্রতিরোধ গড়েছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন কালামে পাকের একটি হরফের উচ্চারণকে বিকৃত করে ভুলভাবে পাঠ করার রেওয়াজ চলছিল, তখন কুরআনের একটি হরফের জন্য মাঠে নেমেছিলেন আল্লামা আব্দুল লতিফ ফুলতলী (র.)। বাংলার মাটিতে কালামে পাকের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি নিজেকে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর যোগ্য উত্তরসূরিরূপে প্রমাণ করেছেন। ঘোষিত নাস্তিকদের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এ দেশের উলামা-মাশায়েখের প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক অগ্রসেনানী। ড. কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন যখন এ দেশে ইসলামী শিক্ষাকে চরমভাবে কোণঠাসা করতে চেয়েছিল, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। মাদরাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। ২০০৭ সালে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সিলেট থেকে ঢাকা অভিমুখে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসের বিশালতম এক লংমার্চ করেন। ২০০৮ সালে ইহলোক ত্যাগ করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাংলার যমীনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শান-মান-ইয্যতের পক্ষে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে তাঁর শক্তিশালী ভূমিকা উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁকে অমরত্ব এনে দিয়েছে।

ইসলাম-বিদ্বেষীরা এই তাসাউফের ইতিহাস জানে না। জানলে সূফীবাদের নামটিও মুখে নিত না। তাদের কথিত সূফীবাদের ধ্বজাধারীরা হচ্ছে একদল দুনিয়া আসক্ত মানুষ, যারা কখনও আল্লাহর জন্য মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। যারা রাজন্যবর্গের দক্ষিণা গ্রহণ করার জন্য দ্বীনকে বিক্রি করতে পিছপা হয় না। যারা আল্লাহর কিতাবকে তুচ্ছজ্ঞান করে, কবর দেখলে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, পীরকে খোদার সমতূল্য মনে করে, আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহ'র কাছে মুনাজাত ধরে, আল্লাহর প্রাপ্য মুহাব্বাত অন্যকে দিয়ে বেড়ায়। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের চেয়ে তাদের পীর বা নেতার আহ্লাদকে বড় মনে করে। যারা ইয়ামামায় মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বীরত্বগাথা পড়েনি, হিত্তীনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পদধ্বনি শুনেনি, আইন জালুতে রুকনুদ্দীন বাইবার্সের রণকৌশল

বুঝেনি, কনস্টান্টিনোপলের দেয়ালে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দেয়নি। ওরা আমাদের নবী ﷺ এর ঘাম-রক্ত-অশ্রুর মর্যাদা কী বুঝবে? ওসব অপকৃষ্ট, হীন, কদর্য মানুষ কীভাবে সূফী হয়? ওদের পথ তো আল্লাহর পথ নয়, আল্লাহওয়ালা প্রকৃত সূফীদের পথ নয়। ওদের তাসাওউফ 'সুলুকে মুহাম্মাদী' নয়। তাগুতের প্রেয়সী ওরা, আল্লাহর প্রিয় নয়।

দ্বীনহীন দাজ্জালদেরকে সূফী বানিয়ে এদের মাধ্যমে ইসলামকে খণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিন্তু এ ষড়যন্ত্র ধুপে টিকবে না। ইসলাম আল্লাহর বাতি, এবং আল্লাহ তাঁর বাতিকে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত করবেন। আল্লাহ বলেছেন,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর বাতিকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহ তাঁর বাতিকে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত করবেন, চাই কাফিররা সেটি অপছন্দ করুক।" (সূরা সাফ, আয়াত-৮)

মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيَبْلُغَن هذا الأمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار ولا يترك الله بيت مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إِلَّا أدخله اللهُ هذا الدِّين

"ইসলাম তথায় পৌঁছে যাবে, যেথায় রাত ও দিন পৌঁছায়। পৃথিবীপৃষ্ঠে ইট-বালির তৈরি ঘর এবং পশমের তৈরি কোনো তাবু বাকি থাকবে না যেখানে আল্লাহ এ দ্বীনকে প্রবেশ করাবেন না।" (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-১৬৯৯৮)

অতএব এ উম্মত তাঁদের নবীর রেখে যাওয়া আমানতকে পৌঁছে দেবে দুনিয়ার দিকে দিকে। আবার মরুগিরি পার হয়ে অভিযান চলবে। আবার আফ্রিকা- ইউরোপে আযানের সুর ধ্বনিত হবে। আবার তাকবীরে তাকবীরে ধরণী ও আসমান প্রকম্পিত হবে। কালিমা তায়্যিবার বিজয়-নিশান আবার পতপত করে উড়বে বিশাল নীল গগনে। প্রতীক্ষা শুধু সময়ের, প্রয়োজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার।

কোনো এক সনদে দুর্বল হলেই কি হাদীসকে দয়ীফ বলা যাবে?

জিয়াউল হক চৌধুরী

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র.) তিরমিযী শরীফে 'এ উম্মতের বিভক্তি' অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ-

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

-রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইয়াহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, খ্রিস্টানেরাও অনুরূপ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এ বিষয়ে হযরত সা'দ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ও হযরত আউফ বিন মালিক থেকে হাদীস রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এটি জানা আছে যে, ইমাম তিরমিযী (র.) তার তিরমিযী শরীফে সাধারণত যে রীতি অনুসরণ করেছেন তা হলো, তিনি একটি অধ্যায়ে একটি বা দু'তিনটি মাত্র হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং হাদীস নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত যে হাদীস অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেননি সে হাদীসখানাই উল্লেখ করেছেন। সাথে সাথে তিনি এ হাদীসটি অন্য কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের নাম উল্লেখ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নীতি হলো, 'ওয়া ফিল বাবি' এ বলে এ বিষয়ে তাঁর জানা অন্যান্য সনদের দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। এ কারণে দেখা যায় পরবর্তীতে অনেকেই উলামায়ে কিরামের ইমাম তিরমিযীর 'ওয়া ফিল বাব' এর উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র কিতাব সংকলন করেছেন। বর্ণিত হাদীসটির ক্ষেত্রেও তিনি আরো তিনজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে সনদের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারা হলেন হযরত সা'দ, আব্দুল্লাহ বিন আমর ও আউফ বিন মালিক (রা.)। এখানে তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) এর হাদীসটিকে 'গরীব' বলেছেন।

মোদ্দাকথা হলো ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসের চারটি মাত্র সনদ সম্পর্কেই অবগত ছিলেন, এর অধিক যদি জানতেন তাহলে তিনি উল্লেখ করে দিতেন। কেননা মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত হাদীসটির তিনি আরো বিশটি সনদের উল্লেখ করেছেন।

বর্ণিত হাদীসটি মুহাদ্দিসীনে কিরাম আরো এগারোজন সাহাবী থেকে উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন হযরত আনাস, জাবির, আবূ উমামা, ইবনে মাসউদ, আলী, আমর বিন আউফ, উমাইর, আবুদ্দারদা, আবূ মুয়াবিয়া (কেউ কেউ মুয়াবিয়া বলেছেন), ইবনে উমার এবং ওয়াসিলা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। অর্থাৎ হাদীসটির সর্বমোট পনেরটি সনদ জানা গেল। অথচ ইমাম তিরমিযী মাত্র চারটি সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসটিকে ইমাম সাখাভী (র.) 'মাকাসিদে হাসানা'য় এবং ইমাম শাতিবী 'আল ই'তিসাম কিতাবে'ও সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটির ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরামের উল্লেখযোগ্য কোনো সমালোচনা নেই। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে বক্তব্যগুলো নিম্নরূপ।

হযরত আনাস (রা.) এর হাদীসটি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'আল-লাআলিল মাসনুআ' কিতাবে উক্বাইলী ও দারুকুতনীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন এবং একে

'মারূফ' ও 'মাহফুয' বলেছেন। আর একথা আহলে ইলমগণের নিকট জানা আছে যে, এদুটি পরিভাষা যথাক্রমে 'মুনকার' ও 'শায' এর বিপরীত।

হযরত আবূ উমামা (রা.) এর হাদীসের ব্যাপারে নূরুদ্দীন হাইসামী (র.) মাজমাউয যাওয়ায়িদ কিতাবে উল্লেখ করেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ أَبُو غَالِبٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْأَوْسَطِ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ أَحَدُ إِسْنَادَيِ الْكَبِيرِ হাদীসখানা ইমাম তাবারানী 'আল মুজামুল আওসাতে' উল্লেখ করেছেন এবং 'আল মুজামুল কাবীরে' কাছাকাছি শব্দে উল্লেখ করেছেন। তাতে আবূ গালিব নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ও অন্যান্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর মুজামে আওসাতের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মুজামে কাবীরে বর্ণিত একটি হাদীসের সনদের অবস্থাও অনুরূপ।

হযরত সাদ (রা.) এর হাদীসটির ব্যাপারে তিনি বলেন, رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ। হাদীসখানা ইমাম বাযযার উল্লেখ করেছেন, তাতে মূসা বিন উবাইদা দুর্বল বর্ণনাকারী।

হযরত ইবনে উমরের হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেন, رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ হাদীসটি আবূ ইয়ালা উল্লেখ করেছেন, এতে লাইস বিন আবূ সুলাইম মুদাল্লিস রাবী, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

হযরত আবূ দারদা ও ওয়াসিলাহ (রা.) এর হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর সনদে কাসীর বিন মারওয়ান খুবই দুর্বল বর্ণনাকারী।

হযরত আমর বিন আউফ (রা.) এর হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ حَدِيثًا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এর সনদে কাসীর বিন আবদুল্লাহ দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর একটি হাদীসকে হাসান বলেছেন। অন্য সকল বর্ণনাকারী সিকা।

ইবনে মাসউদ (রা.) এর হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেন, رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ ইমাম তাবরানী হাদীসখানা দুটি সনদে উল্লেখ করেছেন। একটি সনদের বর্ণনাকারী বুকাইর বিন মারূফ ব্যতীত সকলেই সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা তাকে 'সিকা' বলেছেন। আর তার মধ্যে কিছু দুর্বলতা বিদ্যমান।

হযরত আউফ বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহুর হাদীসখানা মুস্তাদরাকে হাকীমে বিদ্যমান। ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসখানা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) এর শর্তের উপর বিদ্যমান।

ইমাম শাতিবী হযরত আলী (রা.) এর হাদীসখানা উল্লেখ করে বলেন, لا اضمن عهدة صحته আমি হাদীসখানা সহীহ হওয়ার যিম্মাদারী গ্রহণ করব না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো সমালোচনা উল্লেখ করেননি।

হযরত আবূ হুরায়রা ও মুয়াবিয়া (রা.) এর হাদীস একসাথে উল্লেখ করে মুস্তাদরাক গ্রন্থে বলেন, هَذِهِ أَسَانِيدُ تَقَامُ بِهَا الْحُجَّةُ فِي تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ। هَذَا এ সনদগুলো এ হাদীসটিকে সহীহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

বর্ণিত হাদীসটির পনেরটি সনদের মধ্যে তেরজনের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বক্তব্য জানা যায়, এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত আটজন সাহাবীর হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলার অবকাশ রয়েছে। তারা হলেন, হযরত আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ বিন আমর, আনাস, আবূ উমামাহ, আমর বিন আউফ, মুয়াবিয়াহ, ইবনে উমার ও আউফ বিন মালিক। যাদের আলোচনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বাদ বাকী অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদিসের সনদ যদিওবা দয়ীফ তথাপিও 'তাআদ্দুদে তুরুক' তথা বিভিন্ন সনদে বর্ণনা হওয়ার কারণে এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। যে হাদীসটি এত অধিক সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং যার মধ্যে অন্ততপক্ষে আটটি সনদকে সহীহ বা হাসান সে হাদীসটিকে কিভাবে দয়ীফ সাব্যস্ত করা হবে?

উপরের আলোচনা থেকে মোটামুটি এটুকু বলা যায় যে, একটি হাদীস কতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, এ সকল সাহাবীদের থেকে কতজন তাবিঈ বর্ণনা করেছেন এবং সনদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের সংখ্যাও কিরূপ ছিল। অতঃপর একটি হাদীসের সহীহ্ বা দয়ীফ হুকুম দেখে অন্তত এটুকু বিবেচনায় নিতে হবে যে, এ হুকুমটি কি বিশেষ কোন সনদের উপর নাকি সামগ্রিকভাবে সকল সনদের উপর। এখানে এটিও জরুরী নয় যে, একজন মুহাদ্দিস সবগুলো সনদ সম্পর্কে অবগত থাকবেন। (ইস্তেফাদাহ্-তরজুমানুস সুন্নাহ)

এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি কোনো একজন মুহাদ্দিসের নিকট কোনো একটি হাদীসের অনেকগুলো সনদ বিদ্যমান থাকে এবং সেখান থেকে তিনি কেবলমাত্র একটি সনদের উপর ভিত্তি করে হাদীসটিকে সহীহ বলে দেন এবং উসূলে হাদীসের মূলনীতির আলোকে সনদটির সকল বর্ণনাকারী সিকা সাব্যস্ত হন। তবে এই একটি সনদের ভিত্তিতে হাদীসটিকে সহীহ বলা যাবে। কিন্তু কোন একটি হাদীসকে দয়ীফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করতে গিয়ে তার নিকট বিদ্যমান সেই অনেকগুলো সনদের মধ্য থেকে একটি মাত্র দুর্বল সনদ উল্লেখ করে মুতলাকান হাদীসটিকে দয়ীফ সাব্যস্ত করতে পারবেন না। বড়জোর তিনি বলতে পারবেন যে হাদিসটির 'এ সনদটি' দুর্বল। এ কারণে বলা যায় যে, একটি হাদীসকে সহীহ বলে দেওয়া যত সহজ, দয়ীফ সাব্যস্ত করা তত সহজ নয় এবং সনদসহ হাদীস উল্লেখ করা যত সহজ, হাদীসের সনদের ব্যাপারে কোনো হুকুম সাব্যস্ত করা তত সহজ নয়।

প্রথম কথা হলো দয়ীফ হাদীস ফাদাইলে আমাল ও মানাকিব বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। দয়ীফ হাদীসকে বাদ দিলে ইসলামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের অনেকটাই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। সীরাতের কিতাবেও দয়ীফ হাদীসের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি মূলনীতি হলো, যদি কোন দয়ীফ হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তবে তা কিছু শর্তসাপেক্ষে দয়ীফ থেকে হাসান লিগাইরীহির

পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। আর হাসান লিগাইরীহি হাদীস মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট দলীল।

এ প্রসঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য বিষয়ে একটি দয়ীফ হাদীস রয়েছে যেটি ইমাম বায়হাকীর আস সুনানুল কুবরাতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলিম সিদ্দিক হাসান খান ভুপালী তাঁর বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আউনুল বারী'তে উল্লেখ করেন,

واما المرأة فتضم بعضها الي بعض لانه استر لها واحوط لحديث رواه ابو داود في المراسيل عن يزيد بن ابي حبيب انه صلي الله عليه وسلم مر علي امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الي الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل و رواه البيهقي من طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص. (عون الباري–جلد–١ صفحة–٠٢٥)

'আর নারীরা তাদের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাথে (জড়সড় হয়ে) লাগিয়ে রাখবে। কেননা এটি তাদের জন্য অধিক সতর আবৃতকারী এবং এটিই অধিক সতর্কতা। এর দলীল হলো, ইয়াযিদ বিন আবূ হাবীব থেকে বর্ণিত ইমাম আবূ দাউদের মারাসিলে বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি হলো, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুজন মহিলার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের শরীরের অংশ মাটিতে লাগিয়ে রাখবে। কেননা এক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের ন্যায় নয়। হাদীসখানা ইমাম বাইহাকী দুটি ভিন্ন ভিন্ন মাওসুল সনদে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার 'তালখীসে' বলেন, প্রত্যেকটি সনদেই মাতরূক বর্ণনাকারী বিদ্যমান।'

উপরে বর্ণিত বক্তব্যের শুরুতে নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালী পুরুষ মহিলার পার্থক্য উল্লেখ করে হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন এবং এর সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু শেষের দিকে এসে এ হাদীসটি দয়ীফ হওয়া বা সনদে মাতরূক বর্ণনাকারী থাকা সত্ত্বেও কেন হাদীসখানা দলীল তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

فمن يري المرسل حجة و هو مذهب ابي حنيفة و مالك في طائفة والامام احمد في المشهور عنه فحجتهم المرسل المذكور ومن لا يري المرسل حجة كالشافعي و جمهور المحدثين فباعتضاد كل من الموصول والمرسل بالاخر و حصول القوة من الصورة المجموعة.

"যারা মনে করেন, মুরসাল দলীল হতে পারে, তাদের জন্য ইমাম আবূ দাউদের বর্ণিত মুরসাল হাদীসটি দলীল। আর মুরসাল হাদীস দলীল এ মত ইমাম আবূ হানীফার। একদল মনে করেন এটি ইমাম মালেকেরও অভিমত এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকেও এটি প্রসিদ্ধ। আর যারা মনে করেন মুরসাল হাদীস দলীল নয় তাদের মতেও এ হাদীসটি দলীল, আর তা হলো মুরসাল ও মাওসূল হাদীস একটি অপরটিকে মজবুত করবে এবং সামগ্রিক ভাবে দলীলটি সুদৃঢ় হয়ে যাবে। আর এ অভিমত ইমাম শাফিঈ (র.) ও অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের।"

মোদ্দাকথা হলো, দয়ীফ হাদীস যদি একাধিক সনদে বর্ণিত হয় তবে তা শর্তসাপেক্ষে দলীল হয় এবং উসূলে হাদীসের পরিভাষায় তা হাসান লিগাইরিহী'র পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায়। এর একটি প্রকৃত উদাহরণ এ হাদীসটি। যেটির মাধ্যমে স্বয়ং আহলে হাদীসদের একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম মাসআলা ইস্তিম্বাত করে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

রঙ প্রিন্টার্স
একটি নতুন সৃষ্টির চিন্তাধারা

আমাদের সেবাসমূহ

- ম্যাগাজিন
- ভাউচার
- আইডি কার্ড
- ব্যানার
- ক্যালেন্ডার
- খাম
- প্যাড
- ফ্যাস্টুন
- পোস্টার
- চালান বই
- স্টিকার
- গেঞ্জি প্রিন্ট
- লিফলেট
- আমন্ত্রণ কার্ড
- চাঁদা রশিদ
- মগ প্রিন্ট
- ক্যাশ মেমো
- ভিজিটিং কার্ড
- লেভেল
- যাবতীয় ছাপা কাজ।

পিয়ার মাহমুদ, স্বত্বাধিকারী, মোবা: ০১৭১৮ ৩৩৬৮৫৫
আহসান মাহমুদ, পরিচালক, মোবা: ০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
হোসেন মাহমুদ, পরিচালক, মোবা: ০১৭৬৫ ৩৬১৯৬২

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।
E-mail: rangprinter@gmail.com

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

অফিস: বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

সহীহ হাদীসের শ্লোগান : কিছু কথা

মোস্তফা মনজুর

এক.

একগ্রামে এক নাপিত বাস করত। চুল কাটার পাশাপাশি তার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল সে ছোটখাট কাটাছেঁড়া করতে পারত। গ্রামের লোকজনও নির্দ্বিধায় তার কাছে বাহ্যিক ছোটখাট অপারেশন করিয়ে নিত। ঘটনাক্রমে গ্রামে একবার একজন চিকিৎসক আসলেন। নাপিতের দক্ষতা দেখে তিনি ভাবলেন, একে যদি অপারেশনের কিছুটা নিয়ম কানুন শিখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে খুব ভালো হয়; সে আরো ভালো করে গ্রামবাসীর সেবা করতে পারবে। যা ভাবা তাই কাজ। তিনি নাপিতকে নিয়ে শহরে এলেন। কিছুদিন নিজের কাছে রেখে নার্ভ, শিরা-উপশিরা কোথায় কি আছে তা চিনিয়ে দিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে নাপিত তার গ্রামে ফিরে গেল।

গ্রামে লোকেরাও বেজায় খুশি। এতদিন নাপিত না জেনে করেছে; এবার জেনে বুঝে করবে, খুব ভালো হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, নাপিত এখন কাটাছেঁড়া করতেই ভয় পাচ্ছে। কেননা আগে যখন সে চাকু/কাঁচি চালাত তখন জানত না কোথায় কি আছে, কিংবা কি হতে যাচ্ছে। এখন সবকিছু শেখার পর শুধুই টেনশন কাজ করে, না জানি কোনো শিরা কেটে যায় কিনা। ফলে সে আগের মতো নিস্পৃহভাবে কাটার সাহসই করতে পারে না।

প্রিয় পাঠক, এটা নিছকই এক গল্প। কোথায় যেন শুনেছিলাম। কিন্তু যখনই লা-মাযহাবী ভাইদের কথা মনে হয়, তখনই আমার এ নাপিতের কথা মনে হয়। হাদীস আর ফিকহ না জানার ফলে নাপিতের মতো সাহসী হতে তাঁদের কোনো বাধাই নেই। কিন্তু সেসব শিখিয়ে দিলে সম্ভবত যা ইচ্ছা তা-ই বলার মতো সাহস তারা করতেন না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিড়ালের গলায় ঘন্টিটা বাঁধবে কে? কে তাঁদের শেখাতে যাবে? এ জিজ্ঞাসার জবাব অন্য কোনো দিন দেব। আজ লিখছি হাদীস বিষয়ে তাঁদের সামাজিক অবস্থান।

দুই.

হাদীস প্রসঙ্গে লা-মাযহাবী সাধারণ লোকদের প্রচলিত ধারণা বেশ শিশুসুলভ। তাদের অনেক আলিমের বক্তব্যেও এমন মনে হয়; যদিও আমি আশা করি, আলিমগণ হাদীস সম্পর্কে ভালোই জানেন। কেন শিশুসুলভ বলছি, তা ব্যাখ্যা করছি।

১. তাঁদের কাছে হাদীস মানেই- বুখারী ও মুসলিম। বাকী হাদীসের সব কিতাবই অসহীহ (অশুদ্ধ)। মুয়াত্তা, মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম ইত্যাদির কথা বাদই দিলাম, সিহাহ সিত্তাহর বাকী চারটি কিতাবের রেফারেন্স তাদের কাছে কোনো মূল্যই নেই। অথচ সারা বিশ্বে সহীহ হিসেবেই ছয়টি কিতাব সমাদৃত। হ্যাঁ, কিছু দঈফ হাদীস (হয়ত কোনো কোনো আলিমের তাহকীকে/তাখরীজে) এসব কিতাবেও রয়েছে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে দঈফ এমন হাদীস কয়টি আছে তা জিজ্ঞাস্য।

২. লা-মাযহাবীদের কাছে হাদীস দুই প্রকার- সহীহ ও দঈফ/মাউদূ। হয় হাদীস সহীহ হবে, নয়ত দঈফ। এটা কেমন বিভাজন আমি জানি না। হাসান হাদীসের কোন উল্লেখই নেই। লিযাতিহি, লিগাইরিহী এর পার্থক্য বাদই দিলাম। আরো সমস্যা হচ্ছে, মুরসাল, মুদাল্লাস, মুদরাজ এসবের প্রেক্ষিতে দঈফ হাদীসের যে উসূলী পার্থক্য রয়েছে তারও কোন স্পষ্ট বক্তব্য নেই।

৩. সহীহ হাদীসের সংজ্ঞায়নেও পার্থক্য রয়েছে। যে পাঁচটি বৈশিষ্টের আলোকে মুহাদ্দিসগণ কোন হাদীসকে সহীহ বলেন, সে সবের কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনাও তারা দেন না। বরং কেবল একজন মুহাক্কিকের (সময় বিশেষে তাঁদের বক্তব্যের সমর্থক মুহাক্কিকের) বক্তব্যের আলোকেই তাঁদের সব বক্তব্য।

৪. সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে দঈফ কে মাউদূ এর কাতারে ফেলে দেওয়া। এটা নিতান্তই বালকসুলভ ধারণা। প্রিয় পাঠক, হাদীস দঈফ হয় সাধারণত সনদের মধ্যে কোন রাবীর দুর্বলতায়। মতনের কারণে দঈফও আছে, তবে তা সনদের প্রেক্ষিতের তুলনায় নিতান্ত কম।

হাদীস দঈফ হওয়া মানে এই নয় যে, এটা রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্তব্য নয়। মনে রাখবেন, রাবী হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে তার হাদীস মাতরূক (পরিত্যাজ্য), কিন্তু দঈফ বলতেই মাতরূক নয়। কোনো হাদীস দঈফ হওয়া মানে সে বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা হওয়ার সম্ভাবনা ৫০%। সময় বিশেষে এ হার কম-বেশি হতে পারে।

এখন আল্লাহর নবীর ﷺ কথাকে জাল বা বানোয়াট বলার ধৃষ্টতা কে দেখাতে পারে। বলবেন, এটা যে আল্লাহর রাসূলের ﷺ কথা তা প্রমাণিত নয়। ঠিক, কিন্তু তা অপ্রমাণিতও নয়। অর্থাৎ এটা যে রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্তব্য নয়, তাও কিন্তু প্রমাণিত নয়। এমতাবস্থায় কীভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় মাউযূ বা জাল। লা মাযহাবীদের অনেকেই এমন বলে থাকেন।

তিন.

আমার জানামতে, লা-মাযহাবীদের উসূল হচ্ছে- হাদীস সহীহ হলে এর বাহ্যিকার্থের উপর আমল করতে হবে। অন্য কিছু বিবেচ্য নয়। সুন্দর কথা, আমরাও তা চাই। কিন্তু তাঁদের ভাষায় সহীহ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের

উপর আমল না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাযহাবে কেন অন্যরূপ ফতওয়া দেওয়া হলো? ভেবে দেখেছেন কি? প্রিয় ভাই এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যারা ফতওয়া দিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য জানা একান্তই জরুরি।

এটা কি মাযহাবের ইমামদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, নাকি মানুষকে ভুল ইসলামের দিকে চালানোর নিয়তে, নাকি তাঁদের ইলমের স্বল্পতার কারণে, নাকি হাদীস না জানার কারণে? আমি যেসব ধারণা করলাম, আমাদের সালাফ ইমামগণের ক্ষেত্রে এর কোনটাই প্রযোজ্য নয়। এমনকি খালাফদের অসংখ্য আল্লাহওয়ালা মুমিনদের জন্যও প্রযোজ্য নয়। তাঁদের ইমান, আমল, তাকওয়া, ইলম সবই পরীক্ষিত।

এমতাবস্থায় অন্য কোনো মোটিভ হয়ত থাকতে পারে। পাশাপাশি এ চিন্তাও করা উচিত, যারা (লা-মাযহাবী) এসব বলছেন তাঁদের মোটিভ কি? আমি আশা করব, তাঁদের নিয়তও ভালো। তবে তাঁদের ইলম, আমল, তাকওয়া আর ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে আমার সন্দেহ থেকেই যাবে। যেমনিভাবে আমি নিঃসন্দেহ আমাদের সালাফদের ব্যাপারে।

উসূল প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন জাগে-

ক. দুইটি সহীহ হাদীসে বিরোধিতা হলে কি করবেন? উত্তর; অধিক শক্তিশালী (আক্বওয়া) মত গ্রহণ করা হবে। তার মানে বাকীটার আমল বাদ। প্রিয় ভাই, এইটা কেমন কথা, রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস হিসেবে জানার পরও তাঁর আমল বাদ। শুধু রাবীদের দুর্বলতার কারণে। কি আশ্চর্য! মাযহাবের ইমামগণ এখানে সমন্বয় করতেন, হাদীসের শানে উরূদ বা প্রেক্ষাপট দেখতেন, সাহাবাদের আমল দেখতেন। এবার বলুন, উসূল হিসেবে কোনটা বেশি যৌক্তিক, কোনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস মানার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।

খ. সহীহ হাদীসের বিপরীতে দঈফ হাদীস থাকলে তো কথাই নেই। বাদ। অথচ দঈফের ব্যাপারেও নিশ্চিত করে বলা যায় না, এটা রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস নয়। এবার দেখুন রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস কে বেশি মানছেন? মাযহাবীগণ নাকি লা মাযহাবীগণ?

ইমামগণ, বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা, দুর্বল হাদীসকেও শর্তসাপেক্ষে বিবেচনায় নিতেন। কারণ তারা নিজেদের ইজতিহাদ প্রয়োগের চেয়ে দুর্বল হাদীসকেও উত্তম মনে করতেন। [কতিপয় শর্ত- দঈফ হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধী না হওয়া, সমন্বয় করার সুযোগ থাকা, আমল জারী থাকা ইত্যাদি।]

গ. যদি কোনো মাসআলায় সহীহ হাদীস পাওয়া না যায়, তাহলে? এ প্রেক্ষিতে লা-মাযহাবীগণও দঈফ হাদীস আমল করেন। যেমন, নামাযে হাত বাঁধার হাদীস। তাহলে 'দঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়' বলাটা কি স্ববিরোধিতা নয়? আমি জানি না।

ঘ. যেসব মাসআলায় কোন হাদীসই পাওয়া যায় না, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের নানা সমস্যায়, তাঁরা ইজতিহাদের কথা বলেন। অথচ ইজতিহাদের কথা মাযহাবের পক্ষ থেকে বললেই গোমরাহী! কী আজব ফতওয়া!

ঙ. কিছু প্রশ্ন আমার মাথায় প্রায় সময়ই জাগে, লা-মাযহাবীগণ কি উত্তর দেবেন-

- যদি রাবীর আমল তাঁর বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয়, তবে সে হাদীসের হুকম কি?

- যদি মুরসাল হাদীসের উপর আমল প্রসিদ্ধ হয়। সে বিষয়ে আমল কীভাবে হবে?

- ক্বাওলী-ফেলীর পার্থক্য, মাওকুফ-মাকতুর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাখ্যা কি? ইত্যাদি।

চার.

লা-মাযহাবীগণ হাদীসের দুর্বলতা প্রমাণের জন্য বিশেষ করে শায়খ আলবানী (র.) এর বক্তব্যের অনুসরণ করেন। বুখারী-মুসলিমের বাইরে হাদীস পেলেই সে সম্পর্কে আলবানী (র.) এর ফাতওয়া দেখেন। যদি সহীহ হিসেবে পাওয়া যায়, তবে ঠিক আছে, না হলে নয়। অথচ শায়খ আলবানী (র.) এর পূর্বে বহু মুহাদ্দিস এ নিয়ে কাজ করে গেছেন। কতই আশ্চর্য যে হাদীসের সনদের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্রও (আসমাউর রিজাল) সালাফগণ প্রবর্তন করেন। অথচ সালাফদের কারো মতে হাদীস সহীহ বা হাসান হলেও কেবল আলবানীর তাহকীকের কারণে লা-মাযহাবীগণের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য। আবার তারা নাকি সালাফী, সালাফদের অনুসরণ করেন!

হাদীস শাস্ত্রে শায়খ আলবানী (র.) এর খেদমত সমসাময়িক সময়ে অতুলনীয়। কিন্তু তাঁর ভুল হয়নি এমন তো নয়, কোনো কোনো রাবীর ব্যাপারে তাঁর দুইমতও পাওয়া যায়। কেবল একজনের অনুসরণ করে, অন্যদের গোমরাহ বলে দেওয়াই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি গোমরাহী।

পাঁচ.

বস্তুত লা-মাযহাবীগণও হাদীসের ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেটা নিজেদের মতো করে। উদাহরণ হিসেবে নামাযে ফাতিহার বিষয়টাই বলতে চাই। এক্ষেত্রে তিনটি দলীল খুব বেশি প্রযোজ্য।

- কুরআন পড়াবস্থায় শুনা ও চুপ থাকা (সূরা আরাফ, ২০৪)

- সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না (বুখারী)

- ইমামের কিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট (মুয়াত্তা, ইবন মাজাহ, আহমদ)

হানাফীগণের ব্যাখ্যা হচ্ছে, কুরআনের দলীল এখানে প্রাধান্য পাবে হাদীসের উপর। অতএব ইমাম কুরআন জোরে তিলাওয়াত করলে তা শুনা আবশ্যক। আর দ্বিতীয় হাদীস ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য। আর তৃতীয় হাদীস মুক্তাদীর জন্য প্রযোজ্য।

ইমাম মালিকের (র.) ব্যাখ্যা কুরআন জোরে পড়াকালীন মুক্তাদী শুনবে, আস্তে পড়াকালীন অবস্থায় পড়বে। এতে তিন দলীলকেই ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদের (র.) বক্তব্য অনুযায়ী, কুরআনের আয়াত নামাজের প্রেক্ষিতে নয়। দ্বিতীয় দলীল সকলের জন্যই প্রযোজ্য। আর তৃতীয় দলীল ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিরাআতের জন্য প্রযোজ্য।

পাঠকগণ কি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন? কি, সবগুলোই কি সঠিক মনে হচ্ছে না? এখানেই হচ্ছে সমস্যা, যার যার ইজতিহাদে সঠিক মনে হওয়ায় তিনটি মত দেখা যাচ্ছে। এখন কোন বিচারক রায় দেবেন যে, এটা ঠিক আর বাকী দুইটা ভুল। এমন বিচারক কি আছেন? যিনি এমন করবেন তার ইলম নিয়েই সন্দেহ। কেননা ব্যাখ্যার (তাবীল) ক্ষেত্রে অকাট্যভাবে কিছুই বলা যায় না।

আমাদের লা-মাযহাবী ভাইগণও ইমাম শাফিঈ ও আহমদের মত অনুসরণ করেন। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, যখন তারা বলেন অন্যরা ভুল। অথচ ইমাম শাফিঈ বা আহমদ (র.) নিজেও এমন কথা বলেননি। এখানেই তাঁদের সাথে হাদীসের ব্যাখ্যার পার্থক্য। তাদের অনেকে তৃতীয় হাদীসটি দঈফ বলে থাকেন। অথচ হাদীসটি সম্পর্কে নানা বক্তব্য আছে। সহীহ, সহীহ লিগাইরিহী, হাসান, দঈফ অনেক ধরনের বক্তব্যই পাওয়া যায়। তবে এই মর্মার্থের অনেক হাদীস আছে, সাহাবা আর তাবেঈদের আমলও আছে। এমতাবস্থায় তাঁদের একদেশদর্শী ফাতওয়া ইলমে হাদীসের ব্যাপারে তাঁদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

ছয়.

তাবীলের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? কার বক্তব্য মাথা পেতে নেব? সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, আমার বক্তব্য হচ্ছে, যিনি ইলম ও তাকওয়ায় আমাদের চাইতে বেশি অগ্রগামী তাঁকে প্রাধান্য দেব।

উদাহরণস্বরূপ, উপরের মাসআলার কথাই বলি। সাহাবীগণ হচ্ছেন এক্ষেত্রে অনুসরণের জন্য আদর্শ। কেননা নবীজি ﷺ মুক্তাদী হিসেবে নামাজ পড়েননি, ফলে তাঁর আমল জানা অসম্ভব। বাকী রইলেন সাহাবীগণ। তাঁদের আমলে ভিন্নতা ছিল, তা ছিল তাবেঈদের ক্ষেত্রেও। এখন আমদের উচিত তাঁদের যে কোনো একদলকে অনুসরণ করা। নিজে নিজে ব্যাখা না করা।

নিজের জ্ঞানে আমলকারীর ভাবটা এমন যে, তাঁদের যোগ্যতা কম ছিল ফলে তারা কুরআন-হাদীস বুঝতে পারেননি। ফলে আমলও ঠিক করেননি। অথচ লা-মাযহাবী সালাফীরাই বলে থাকেন, আমরা কুরআন-হাদীস বুঝব যেভাবে সাহাবীগণ বুঝেছেন, তাবেঈগণ বুঝেছেন। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় তাদের ভিন্নতা। আল্লাহই জানেন, তাঁদের উদ্দেশ্য কি?

প্রিয় পাঠক, আমাদের ইলম কম, আমল কম, তাকওয়া আরো কম (আছে কি না তাতেই সন্দেহ)। অথচ সাহাবা, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণের ইলম, আমল, তাকওয়া সবই পরীক্ষিত। এমনকি তারা তাঁদের এসব নিয়েই গত হয়েছেন, আমাদের সে নিশ্চয়তাও নেই। হ্যাঁ, হয়ত বাহ্যিক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অনেক ইলমী যোগ্যতাসম্পন্ন মনে হতে পারে, অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। আর আমল ও তাকওয়ার বিচারে সালাফদের সাথে আমাদের কোন তুলনাই চলে না। [নবীজির ﷺ জামানা হতে যত দূরে যাচ্ছি ততই ইলম, আমল আর তাকওয়ার ঘাটতি বাড়ছে। তাতে যিনি সন্দেহ করছেন, তিনি এ লিখার পাঠক নন]।

সালাফদের সিদ্ধান্ত ছিল দীনের জন্য; আর আমাদের সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই নিজেদের স্বার্থে, দলের স্বার্থে, গলাবাজির স্বার্থে। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। সাহাবা তাবিঈদের অনুসরণ করে হাদীস ব্যাখ্যা করবেন? নাকি নিজেদের ইলমের উপর আস্থা রেখে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখেই বাকী সব হাদীস ও দলীল অগ্রাহ্য করে আমল করবেন?

প্রিয় ভাই, নিজের আমল, ইলম আর তাকওয়ার উপর আমার অন্তত কোনই ভরসা নেই; বরং সালাফ ও ইমামদের ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভরসাতেই তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রহণকেই কল্যাণকর মনে করি, আবশ্যক মনে করি। আমাদের ইমামগণ, সালাফ, তাবিঈ, সাহাবাগণের চাইতে যদি আপনার নিজেদের ইলমের উপর বেশি আস্থাবান হন, তবে তো ভালো! সময় সুযোগ পেলে এমন মহারথীদের সাথে সাক্ষাত করে রাখা বোধ হয় জরুরি। কেননা সালাফদের চাইতেও আমল, আখলাক আর ইলমে উন্নত প্রাণির দেখা পাওয়া কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়।

সাত.

নিজেদের জ্ঞান দ্বারা বুঝার ক্ষেত্রে আমি একটি হাদীসের উল্লেখ করছি। যাতে খুবই প্রয়োজনীয় একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। 'আব্বাদ ইবনু তামীম (র.) এর চাচা থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, তার মনে হয়েছিল যেন নামাযের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল (বায়ু নির্গত হয়েছিল)। তিনি বললেন, সে যেন ফিরে না যায় যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়। (বুখারী-মুসলিম)

প্রিয় পাঠক, বুখারী-মুসলিমের হাদীস, সুতরাং অসহীহ প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। এবার একটু চিন্তা করুন, এর আমল কিরূপ? শব্দ না শুনলে বা গন্ধ না পেলে নামাজ ছাড়া যাবে না। তাই তো। প্রিয় ভাই, গন্ধ বা শব্দ ছাড়া যদি বায়ু নির্গত হয়? তাহলে? এ হাদিসের বাহ্যিকার্থ কিন্তু বলে নামাজ চালিয়ে যেতে হবে। এমনভাবে আমল করেছেন বলে আমি ঘটনা জানি, অর্থাৎ গন্ধ বা শব্দ না হওয়ায় বায়ু নির্গত হয়েছে জেনেও নামাজ ছাড়েননি। হাদীসে আছে যে!

প্রিয় পাঠক, এই কাজটা কিন্তু মারাত্মক ভুল। এ হাদীসের উদ্দেশ্য সন্দেহবাতিক লোক। যারা সবসময় উযূ চলে গেল বলে সন্দেহে ভুগেন, আপনি-আমি নয়। তাছাড়া এ হাদীসের শব্দগুলোর উদ্দেশ্য, উযূ চলে যাওয়া প্রসঙ্গে নিশ্চিত হওয়ার কথা বলা। অর্থাৎ আপনি যদি নিশ্চিত হন উযূ চলে গিয়েছে তাহলে শব্দ আর গন্ধের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই।

কেননা অন্য হাদীসে গন্ধ ছাড়া শব্দের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন- আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তির হাদাস হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে উযূ করে। হাযরা-মাওতের জনৈক ব্যক্তি বলল, 'হে আবূ হুরায়রা! হাদাস কী? হাদাস কী?' তিনি বললেন, 'নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।' (বুখারী-মুসলিম)।

আট.

প্রিয় পাঠক, বলতে পারেন এমন তো সব সময় হয় না। সব হাদীসেও হয় না। দু একটাতে এমন ঝামেলা থাকতে পারে।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। বেশিরভাগ হাদীসের বাহ্যিকার্থ ফিকহের দলীল হিসেবে গৃহীত। কেননা এদের প্রেক্ষাপট, ইল্লত-হিকমত, আমল ইত্যাদি বিবেচনা করে এমনই পাওয়া গেছে। এসব হাদীস পড়ে, সে অনুযায়ী আমল করতেই পারেন। কিন্তু যেসব হাদীস বাহ্যিকার্থ বুঝা দুষ্কর, কিংবা যার প্রেক্ষাপট ভিন্ন, অথবা যেসব হাদীসের বিপরীত বর্ণনা আছে, সেসবের ক্ষেত্রে কি করবেন? আর কীভাবেইবা বুঝবেন কোনটা সরাসরি

আমলযোগ্য কোনটা নয়? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এসব হাদীস আমলের জন্য বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন, প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট উসূল বা মূলনীতির অনুসরণ। মাযহাবের ইমামগণ এ কাজটাই করে গেছেন। এরপরও যদি আপনি নিজে ইজতিহাদ করতে চান, করুন! মুজতাহিদ হলে কোন সমস্যা নেই। আর না হলে বিনা উযূতে নামাজ পড়ে কিয়ামতে দেখবেন আমলনামা শূন্য। সেটা আমরা যেমন চাই না, তেমনই নিশ্চয় আপনারাও চান না।

নয়.

১.

প্রিয় পাঠক, নিচে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। এতে সাহাবাদের দুই রকমের অভিমত আছে। আমি জানতে চাই, আপনি সে সময় থাকলে কোনটা অনুসরণ করতেন? এবং কেন? যারা আরবী জানেন তাঁদের জন্য আরবী টেক্সটও দিয়ে দিচ্ছি।

ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আহযাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন, বনূ কুরাইযায় না পৌঁছে কেউ আসরের সালাত আদায় করবেন না। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেলে তাদের একাংশের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার আগে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করব, সময় হলেও রাস্তায় সালাত আদায় করা যাবে না উদ্দেশ্য তা নয়। বিষয়টি নবী ﷺ এর কাছে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলের প্রতিই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেননি। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৪১১৯)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ "لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

২.

প্রিয় পাঠক, আপনারা যেনো ভুল না বুঝেন সে জন্য এ হাদীসের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরছি।

ক. হাদিসটি সাহাবাদের ইজতিহাদের অন্যতম এক দলীল।

খ. নবীজী ﷺ উভয় দলের কাউকেই ভুল বলেননি। এমনকি কোনো এক দলকে ঠিক বা উত্তমও বলেননি।

গ. এটি ফিকহী ক্ষেত্রে ইল্লত আর হিকমত এর গুরুত্বেরও প্রমাণ বহন করে।

৩.

সতর্কতা-

প্রিয় পাঠক, আপনাদের অনুমান যেমনই হোক, এটাকে চূড়ান্ত ধরে নেবেন না, বা এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। এ হাদীসের দুদলই ঠিক, দুটি ব্যাখ্যাই ঠিক। এটা মাথায় রাখবেন। এরপর নিজের অগ্রাধিকার বলবেন, আপনারা কেবল এক/দুই উল্লেখ করলেও চলবে। ইচ্ছা করলে কারণও বলতে পারেন। ধরে নিতে পারেন, আপনিও সে দলে ছিলেন। এমতাবস্থায় আপনার আমল নিশ্চয়ই একদলের ন্যায়ই হত, আপনি কোনটি করতেন? মত দুটি হচ্ছে-

এক. সময়মত রাস্তায় নামাজ পড়া।

দুই. বানূ কুরায়যায় গিয়ে নামাজ পড়া।

আমি কেন জিজ্ঞাসা করছি তা আপনাদের মতামত পেলে জানাব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহু আলাম। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

আমাদের করণীয়

প্রথম কথা, আমরা হাদীস পড়ব, জানব, কোন সমস্যা নেই। বরং মুসলিম হিসেবে এটাও আমাদের অন্যতম দ্বীনী দায়িত্ব। তবে সাথে সাথে কিছু সম্পূরক কাজও করব-

-একজন বিজ্ঞ, গ্রহণযোগ্য আলিমের কাছ থেকে প্রশ্ন ও খটকাগুলো নিরসণ করে নেব।

-ফেসবুকে পাবলিকের কাছে ব্যাখ্যা চাইব না

-নিজেদের পরিবারে একজন আলিম বানানোর চেষ্টা করব। যেন সময়ে অসময়ে তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতে পারি।

-হ্যাঁ, তালিবে ইলম ও আলিমগণের জন্য, হাদীসের ভিত্তিতে গবেষণামূলক পড়া চালিয়ে যাওয়া জরুরি। তারা হাদীসের সার্বিক তাহকীক করবেন, এর হুকুম জানবেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে এর আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবেন, ফিকহী ক্ষেত্রে তারজীহ দেওয়ার যোগ্যতা থাকলে দেবেন। এসবই জরুরি। কেননা তাতে উম্মতেরই ফায়দা।

তবে সবই দ্বীনের মূলনীতি অনুসরণ করে, নিজেদের যুক্তি আর বুদ্ধিতে নয়, আর নিয়তের গরমিলের সাথেও নয়। কেননা এ দু কারণে উলামা ও তালাবাগণ যেমন ডুববেন, উম্মতকেও ডুবাবেন।

-সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, হাদীস দেখেই তা থেকে ফতওয়া দেব না বা নেবও না। অর্থাৎ আমল শুরু করব না, যতক্ষণ না আলিমের নিকট থেকে এর ব্যাখ্যা ও ফিকহী আমল জেনে নেব।

এই একটি আমল যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনার হাদীস অধ্যয়ন বিপথে যাবে না। নয়তো পড়বেন হাদীস, অনুসরণ করবেন খাহেশাতের, নিজের পছন্দের দলের। রাসূলের ﷺ আনুগত্য, সালাফের অনুসরণ বা দীনের অনুশীলন কোনটাই হবে না। এবার সিদ্ধান্ত আপনার।

সাইমুন

লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

এখানে স্কুল-কলেজ-মাদরাসার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক কোরআন শরীফ, ধর্মীয় বই, স্কুলব্যাগ, স্টেশনারী সহ অন্যান্য গিফ্‌ট সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

পরিচালক: মাওলানা আতাউর রহমান

মোবাইল: ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯

শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ

(হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন)

সোবহানীঘাট, সিলেট

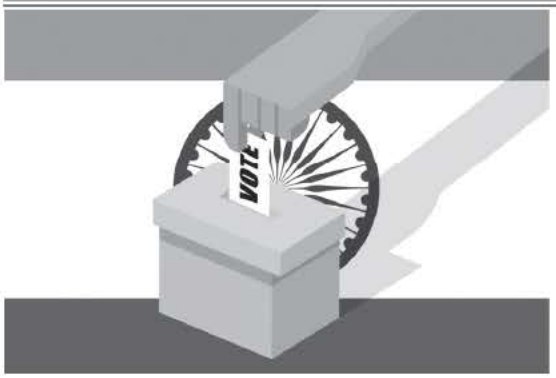

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে ভোট

আব্বাস সিদ্দিকী ও 'বাংলাদেশি' প্রসঙ্গ

রহমান মোখলেস

আগামী চলতি মার্চ-এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ ভারতের পাঁচ রাজ্যের বিধান সভার ভোট। ইতোমধ্যেই ভোটের রাজনীতিতে সরব হয়ে ওঠেছে রাজ্যগুলো। তেতে উঠছে রাজনীতির মাঠ। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের ভোটের মাত্রায় এবার যোগ হয়েছে নতুন সমীকরণ। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দিকে সবার দৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের ভোটের রাজনীতিতে মুসলিম ভোট গুরুত্বপূর্ণ। এবারও মুসলিম ভোট নিয়ে শুরু হয়েছে বিভিন্ন দলের নানা তৎপরতা। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট আছে। আর এই মুসলিম ভোটের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে কোন দল ক্ষমতায় যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সাল থেকে পরপর দুই মেয়াদে ক্ষমতায়। দুই বারেই মুসলমানরা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটব্যাংক। এর আগে যখন বাম জোট ক্ষমতায় ছিল, তখন বাম জোটের ভোটব্যাংক ছিল মুসলমানরা। এছাড়া কংগ্রেসও মুসলমানদের কিছু কিছু ভোট পেয়ে এসেছে। কিন্তু এবার মুসলিম ভোট নিয়ে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল শঙ্কায়। মমতা জন্য আতঙ্কের খবর হলো, রাজ্যের মুসলিম ভোটব্যাংকে এবার ভাগ বসাতে পারেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী। আব্বাস সিদ্দিকী গত ২১ জানুয়ারি 'ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট' নামে একটি নতুন দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। আব্বাস সিদ্দিকী তাঁর ভাই নৌশাদ সিদ্দিকীকে এই দলের চেয়ারম্যান করেছেন। একই সঙ্গে তিনি দলীয় পতাকার আবরণ উন্মোচন করেন এবং ঘোষণা দেন 'ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট' পশ্চিমঙ্গের বিধান সভার নির্বাচনে লড়বে। পিছন থেকে সেই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন তিনি।

আব্বাস সিদ্দিকী বলেছেন, '৭৪ বছর ধরে এ রাজ্যের দলিত ও সংখ্যালঘু মানুষকে তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, সংসদীয় রাজনীতিতে এসে এইসব অসহায় মানুষের হয়ে আওয়াজ তোলা। আর সেজন্যই দল গড়েছি।'

কে এই আব্বাস সিদ্দিকী

পশ্চিমবঙ্গের ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব আবূ বকর সিদ্দিকীর অধস্তন পুরুষ আব্বাস সিদ্দিকী। তার চাচা ত্বহা সিদ্দিকী এতদিন তৃণমূলকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু আব্বাস সিদ্দিকী নতুন দল গঠনের পর সরাসরি নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ৪৪টি আসনে প্রার্থী দিতে চান তিনি। এতে বেড়েছে মমতার অস্বস্তি, বেড়েছে শঙ্কাও। ত্বহা সিদ্দিকী এতদিন মমতাবিরোধী কোনো কথা বলেননি। কিন্তু আব্বাস সিদ্দিকী বেশ কিছুদিন ধরেই মমতাবিরোধী মন্তব্য করে চলছেন। এদিকে সম্প্রতি আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করেছেন এমআইএম (মিম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। আসাদউদ্দিন ভারতে মুসলিম রাজনীতির জন্য জনপ্রিয়। বিহারের গত নির্বাচনে ওয়েইসির দল পাঁচটি আসন লাভ করে। বিহারে সাফল্য পাওয়ার পরে হায়দ্রাবাদের এই রাজনীতিক আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গেও ভোটে লড়তে চাইছেন। আসাউদ্দিন ওয়েইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিশে ইত্তেহাদুল মুসলেমিন (এমআইএম) বা সংক্ষেপে মিম। হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক এই দলটি এতদিন তেলেঙ্গানা রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও দলটির বিস্তার ঘটছে।

নতুন দল ঘোষণা করে আব্বাস সিদ্দিকী বলেছেন, মুসলিম-দলিত-আদিবাসীদের স্বার্থে কাজ করবে তার দল। আপাতত উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও হুগলিকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করবে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট। দলটি রাজনৈতিক সমঝোতা করতে রাজি যেকোনো দলের সঙ্গে। শুধু বিজেপি নয়, ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও আসাউদ্দিন ওয়েসির দল মিম এর সঙ্গে তাদের কথাবার্তা এগিয়েছে। তবে ফুরফুরা দরবার শরীফের এই পীরজাদা নিজে ভোটে লড়বেন না। তিনি জানান, 'আমি কিং হতে চাই না, কিংমেকার হব।'

আব্বাস বলেন, 'তার দলের সঙ্গে কারা যুক্ত হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে আমরা একটা মহাজোট চাই। এই মহাজোটে যারা আসবেন না, তারা আমাদের প্রতিপক্ষ।' আব্বাসের মতে, 'এ রাজ্যে বিজেপি সক্রিয় ছিল না। মমতাই তো বিজেপিকে নিয়ে এসেছে।'

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের নানা সমীকরণ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ফুরফুরা শরীফ বরাবরই আলোচিত বিষয়। ভোটের আগে এখানকার পীরজাদারা মুসলিমদের কাকে ভোট দেওয়া উচিত, এই মর্মে নানা মন্তব্য করেন। আর এবার দল গঠন করে সরাসরি নির্বাচনের মাঠে। নির্বাচনে নতুন এই মেরুকরণে শঙ্কায় স্থানীয় মুসলমানেরাও।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের বক্তব্য, আব্বাস সিদ্দিকীর পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন দল

হওয়ায় মুসলিম ভোটব্যাংকের একটি বড় অংশ তৃণমূলের থেকে সরে যাবে। তৃণমূলের ভোট কাটবে। যা বিজেপির জন্য সুবিধাজনক হবে। কোনো কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষকের বক্তব্য, পিছন থেকে আব্বাসকে উসকে দিচ্ছে বিজেপি। আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে এক সময় মুকুল রায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মুকুল রায় তখন তৃণমূলে। এখন মুকুল রায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এমন কথা চাউর রয়েছে যে, আব্বাস সিদ্দিকীকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন মুকুল রায়। অবশ্য আব্বাস সিদ্দিকী সে কথা মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ আছে। আর তাঁর রাজনীতি যতটা তৃণমূলবিরোধী, ঠিক ততটাই বিজেপিবিরোধী।

সম্প্রতি আব্বাস সিদ্দিকী ডয়েচে ভ্যালেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে ধর্মনিরেপক্ষতার নাম করে বহু রাজনৈতিক দল সামনে এসেছে। কিন্তু গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া সবাই বঞ্চিত। মুসলিম, দলিত, আদিবাসীরা তো বটেই, হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশের মানুষও পিছিয়ে আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোনো দিক দিয়েই পরিষেবা পান না। তাঁরা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠ হয়ে ওঠাই হবে তাঁর দলের লক্ষ্য। শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকারগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাঁর দল।'

বিজেপির জন্য পোয়াবারো

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে এবার ধর্মীয় মেরুকরণের নির্বাচন হবে। বিজেপি ধর্মীয় তাস খেলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার উত্তর দিতে গিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণ বৃদ্ধি করছেন। এদিকে এতদিন মুসলমানদের ভোটব্যাংকের কারণে বিশেষ সুবিধা পাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচনে তুমুল চাপের মুখে পড়তে পারে। এমনকি নির্বাচনে বিজেপিই চলে আসতে পারে পশ্চিমবঙ্গে।

তবে এ বিষয়ে আব্বাস সিদ্দিকীর মত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন, 'তৃণমূল উন্নয়নের স্বপ্ন দেখালেও মেলেনি কিছুই। সেই জন্যই পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য নতুন দল। রাজ্যে বিজেপিকে এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য সৌগত রায়ের মতে, আব্বাস সিদ্দিকী নতুন প্লেয়ার হিসেবে মাঠে নামলেও রাজ্যের সংখ্যালঘুদের ভোট তৃণমূলেই পাবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'রাজ্যে সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের সঙ্গেই ছিলেন, তৃণমূলের সঙ্গেই থাকবেন।'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের একটি সূত্রের দাবি, আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে তাদেরও কথা হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে যদি সম্পর্ক না থাকে, তাহলে রাজ্যের কয়েকটি আসনে বাম-কংগ্রেস জোটের কাছাকাছি আসতে পারে আব্বাসের দল। তবে সবটাই নির্ভর করছে আব্বাসের দলের সমীকরণ কী হবে, তার উপর। কারণ, ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে বিশেষ করে বামদের পক্ষে সেই দলের সঙ্গে প্রকাশ্যে জোট তৈরি করা অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে এখন বাম ও কংগ্রেস একজোট হয়েছে। তারা আব্বাস সিদ্দিকীর দলকেও কাছে টানতে চাইছে। এ নিয়ে উভয়ে আলোচনাও চলছে। এতে কংগ্রেস ও বামজোটের আসন কয়েকটি বাড়তে পারে। কিন্তু আখেরে লাভ হবে বিজেপির।

আর আব্বাস সিদ্দিকীর দলও বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের জোটকেই তাদের স্বাভাবিক মিত্র বলে মনে করছে। আব্বাস সিদ্দিকীর ভাষায়, রাজ্যের দুই অপশক্তি তৃণমূল ও বিজেপি। তিনি বলেন, 'এই দুই অপশক্তির বিরুদ্ধে জোট করে লড়তে সম্মত হয়েছি মিম প্রধানের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে আমার নেতৃত্বেই মিম লড়বে। এছাড়া আরও ১০টি দলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা সবাই আমার নেতৃত্বে লড়তে প্রস্তুত। বিজেপি-তৃণমূলকে হারাতে সবাইকে একই ছাদের তলায় আসতে হবে।'

এদিকে সিপিএমের মোহাম্মদ সেলিম এবং কংগ্রেসের আবদুল মান্নান, এই দুই নেতা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম ভোট হারাতে চায় না শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এ রাজ্যে মুসলিম ভোটের বড় অংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে ভোট দেয় বলে মনে করা হয়।

সমীকরণ যা-ই হোক, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে আব্বাস সিদ্দিকী যে নতুন অঙ্ক তৈরি করতে চলেছেন, তা মোটামুটি স্পষ্ট। আব্বাস জানিয়েছেন, তিনি ৪০ থেকে ৫০টি আসনে প্রার্থী দিতে চান। ধরে নেওয়া যায়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসানগুলোই আব্বাস সিদ্দিকীর টার্গেট। যদি তাই হয়, তা হলে সেসব আসনে ত্রিমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে। বিজেপি যার সুযোগ পেতে পারে।

দীর্ঘ সময় ধরে কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকেই রাজ্যের মুসলমানরা ভোট দিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিনিময়ে কোনো দলের কাছ থেকেই এখনও মুসলমানরা তেমন একটা কিছু পাননি। মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা প্রশ্ন তুলছে যে, এভাবে শুধুই তো ওইসব দলগুলোর ওপরে ভরসা করে থাকা যায় না। যে রাজ্যেই মুসলিমরা নিজেদের আইডেন্টিটি পলিটিকস করেছে, সেখানে তাদের উন্নয়ন হয়েছে। আসামে করেছেন বদরুদ্দীন আজমল। সে রাজ্যের মুসলমানরা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কেরালায় মুসলিম লীগ আছে, সেখানকার মুসলিমরা উন্নতি করেছে। হায়দ্রাবাদ-তেলেঙ্গানায় ওয়াইসির এআইএমআইএম আছে, তার ফলে উন্নয়ন হয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই মুসলমানরা সেক্যুলার দলের সঙ্গে থেকেছে বলেই সব থেকে খারাপ অবস্থা এই রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির উত্থানও দৃশ্যমান। গত ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের পর থেকে সেই ছবি কিছুটা স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে লোকসভার আসন ৪২টি। এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৮টি। এছাড়া ১৮টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লোকসভা আসনের ৪টি তৃণমূলের থেকে বিজেপির হাতে গিয়েছে। এগুলো হল বালুরঘাট, কোচবিহার, বনগাঁ ও রানাঘাট। যে যাই বলুক, পশ্চিমবঙ্গে আব্বাস সিদ্দিকীর দলের প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণার পর থেকেই মুসলিম ভোট ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যাতে আখেরে বিজেপিরই লাভ।

এদিকে নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপি আর তৃণমূলের মধ্যে চলছে জোর লড়াই। মমতা বলছেন, তৃতীয়বারের মত তারাই ক্ষমতায় আসবেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। আর বিজেপিরও এবার জোর এজেন্ডা পশ্চিমবঙ্গ ঘিরে। তারা যেভাবেই হোক তৃণমূলকে হটাতে চায়। তারা ইতোমধ্যেই মমতার বেশ কিছু গুরুত্বপূণ© মন্ত্রীসহ দলের অনেক বিধায়ক ও নেতাকে ভাগিয়ে নিয়েছেন। খুব ঘনঘন পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। মুসলিমদের ভোট কাড়তে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুর নগরে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে অমিত শাহ বলেন, নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)কার্যকর হলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নাম বাদ যাবে এ কথা ঠিক নয়। ওরা (তৃণমূল, বামদল এবং কংগ্রেস) মিথ্যা প্রচার করছে।

সর্বশেষ পাওয়া তথ্যমতে, আসন বণ্টন নিয়ে আব্বাস সিদ্দিকী ও বাম-কংগ্রেস জোট ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে নি। আব্বাস সিদ্দিকীর দাবি ৪৪টি আসন, তবে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু ছাড় দেওয়া হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন আইএসএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকী। আব্বাস সিদ্দিকী বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন জোট তৈরিতে অযথা দেরি তার পছন্দ নয়। যদি কোনও কারণে সেই জোট না হয়, তবে তিনি একাই ভোটে লড়বেন। ইতিপূর্বে কয়েকটি বৈঠকে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ২৮ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে কোনো ফলাফল আসতে পারে।

আসামে প্রচারণায় বাংলাদেশী প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ সীমান্তের লাগায়ো পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম। ফলে উভয় রাজ্যেই নির্বাচনী প্রচারণায় আছে বাংলাদেশ। অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গে এক নির্বাচনী সমাবেশে বলেছেন, রাজ্যে বিজিপি ক্ষমতায় এলে, বাংলাদেশ থেকে একটি পাখিও সেখানে ঢুকতে পারবে না। আর আসামে বিজেপির প্রধান নেতা হেমান্ত বিশ্বশর্মা এবারের নির্বাচনকে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে আসামের সভ্যতা রক্ষার সংগ্রাম' বলে উল্লেখ করেছেন। আর এই দুই রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম ভোট থাকায় এ দেশের অনেক মানুষের মনোযোগও এই নির্বাচনের দিকে।

বিজেপি ও আসাম গণপরিষদ স্থানীয় বাংলাভাষীদের 'বাংলাদেশি' আখ্যা দিয়ে ভোটের ময়দানে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। তবে এ রাজ্যে জোট গড়ে সুবিধায় আছে কংগ্রেস, আর প্রচারে এগিয়ে বিজেপি। আসামে বিধানসভায় আসন ১২৬। সর্বশেষ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৬০টি আসন পায়। যা আগের নির্বাচনের চেয়ে ৫৫টি বেশি। ১২৬ আসনের মধ্যে ৮৬টি পেয়ে সরকার গঠন করে বিজেপি ও আসাম গণপরিষদ জোট। বাকি ৪০টির মধ্যে ২৬টি পায় কংগ্রেস এবং ১৪টি আঞ্চলিক দল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)। আসামের রাজনীতির তৃতীয় শক্তি এই দল। যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাওলানা বদরুদ্দীন আজমল। বিজেপি সুযোগ পেলেই তাঁকে বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছে। গরম করছে ভোটের মাঠ। মাওলানা আজমলের দলের ভোট এ রাজ্যের নির্বাচনে একটি বড় ফ্যাক্টর।

কংগ্রেস ও বিজেপির আলাদা জোট

আসামে বহুবছর ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। সর্বশেষ ২০০১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত একনাগাড়ে তারা এখানে ক্ষমতায় ছিল। এবার কংগ্রেস মাওলানা আজমলের দল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ) এবং ছোট ছোট বাম দলগুলোর সঙ্গে জোট করার ঘোষণা দিয়েছে। আর বিজেপি বলছে, তারা আগের মতোই 'বিদেশি খেদাও' আন্দোলনের শক্তি আসাম গণপরিষদের সঙ্গে জোট করবে। এই হিসাব শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকলে কংগ্রেস কিছুটা লাভবান হতে পারে। মুসলিম ভোট আর ভাগ হবে না। আবার এতে বিজেপিরও সুবিধা। কংগ্রেস যখনই মুসলমান প্রধান এআইইউডিএফের সঙ্গে জোট করবে, তখনই বিজেপি জোর প্রচারণায় পুরো ভোটারদের ধর্মের ভিত্তিতে দুভাগ করে ফেলবে। এতে কংগ্রেসের মুসলিম ভোট বাড়লেও হিন্দু ভোট কমবে।

রাজ্যে কংগ্রেসের বড় ভোটব্যাংক মুসলমানরাই। এ রাজ্যের ৩৫ ভাগ মুসলমান ভোট রয়েছে। কংগ্রেস যেসব এলাকায় শক্তিশালী সেগুলো মুসলমানপ্রধান। তবে এই ভোটব্যাংক দুইভাগে বিভক্ত। ৩৫ ভাগ মুসলমানের মধ্যে আছে বাংলাভাষী ও অসমিয়াভাষী ধারা। অন্যদিকে ৬২ ভাগ হিন্দু ভোটারের মধ্যে আছে বোড়ো উপজাতি ও অসমিয়া ধারা। এছাড়া রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা আচরণে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার মাঝেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। চা-শ্রমিকেরাও এই রাজ্যে এক ছোটখাটো ভোটব্যাংক। ১২৬ আসনের ৪৫টিতে তাঁরা আছেন বিভিন্ন সংখ্যায়। একসময় অতি দরিদ্র এই শ্রমিকেরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। এখন অবস্থা সেরকম নেই। ভোট কাড়তে বিজেপি সাত লাখ শ্রমিককে ৩ হাজার রুপি করে নগদ প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

আসাম গণপরিষদ 'বিদেশি খেদাও' আন্দোলনের বড় শক্তি। আসাম গণপরিষদ মনে করে রাজ্যের মুসলমানরা বাংলাদেশ থেকে সেখানে গিয়েছে। অতএব 'বিদেশি খেদাও' এই স্লোগান তাদের। নির্বাচন এলেই যা আরো জোরালো হয়।

অসমিয়া তরুণেরা বিজেপির বিরুদ্ধে

বিজেপি এবার কিছু কৌশলগত অসুবিধায় আছে। কংগ্রেস-এআইইউডিএফ জোট তাদের জন্য ভোটের গণিতে এক বড় চ্যালেঞ্জ। আরও বড় সংকট অনেক অসমিয়া তরুণের ভোট তারা হারাতে পারে। আসামে 'নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে'র বাস্তবায়ন চায় না এই অসমিয়ারা। এ রকম অন্তত দুটি দল নির্বাচনে আলাদা জোট করেছে। এ হিসাবে গতবারের চেয়ে বিজেপির ভোট কমে যেতে পারে।

তবে বসে নেই বিজেপি। তারা নতুন কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে। বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে 'মিঞা' তকমা দিয়ে আসামের খলচরিত্র হিসেবে তুলে ধরছে তারা। আর এভাবে কংগ্রেস ও মাওলানা আজমলের দল এআইডিইউএফ জোটকে সমগ্র ভোটারদের কাছে 'আসামবিরোধী' ও 'বাংলাদেশপন্থী' হিসেবে দেখানোর কৌশল নিয়েছে বিজেপি।

এ নিয়ে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চলছে তাদের জোর প্রচারণা। নির্বাচনের বিজেপির প্রধান সেনাপতি সীমান্ত বিশ্বশর্মা ইতিমধ্যে বলা শুরু করেছেন: 'আমরা মিঞাদের ভোট চাই না।' তাঁর মতে 'মিঞা' মুসলমানরা 'বাংলাদেশ থেকে আসামে গিয়েছে।'

অসমিয়াদের স্বতন্ত্র জোট

কংগ্রেস ও বিজেপির বাইরে আসামে এবার তৃতীয় জোটটি গড়েছে দুটি আঞ্চলিক দল। একটির নেতৃত্বে কৃষকনেতা অখিল গগৈ। দলের নাম 'রাইজর দল'। অসমিয়া ভাষায় রাইজর মানে জনতা। অখিল গগৈ এক বছর ধরে কারাগারে। বারবার তাঁর জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, দেমাজি, মাজুলি প্রভৃতি অসমিয়াপ্রধান জেলায় এই দলের প্রভাব আছে। এককালে এসব জেলায় উলফার প্রভাব ছিল। রাইজর দলের সঙ্গে আছে আসাম জাতীয় পরিষদ। এর নেতৃত্বে লুরিন জয়তী গগৈ। দুটি দলই আসামে নাগরিকত্ব নেই এমন অ-মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধী।

নাগরিকত্ব আইন ও 'অবৈধ বাংলাদেশি' ইস্যু

এবারে আসামর নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্ম ও জাতিগত বিভেদ-সংঘাতই প্রধান ইস্যু। দীর্ঘদিন এই রাজ্যে বিতর্কের প্রধান বিষয় তথাকথিত নাগরিকত্ব আইন ও 'অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান' ইস্যু। প্রায় ৩০ বছর ধরে এই ইস্যুতে আসাম উত্তাল। একসময় বলা হতো প্রায় এক কোটি 'অবৈধ বাংলাদেশি' আছে আসামে। তার খোঁজ নিতে 'এনআরসি' (নাগরিকদের শনাক্ত করা) হয়। ওই দাবির সত্যতা মিলেছে সামান্যই। হিন্দু-মুসলমান মিলে মাত্র ১৯ লাখ নাগরিকের কাছে নাগরিকত্বের কাগজপত্রের অভাব দেখা গেছে। সাড়ে তিন কোটি মানুষের রাজ্যে যা মাত্র ৫ শতাংশের মতো। আর এর মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি। বিজেপি বাদপড়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিতে চাইলেও অসমিয়ারা এর ঘোর বিরোধী। তারা নতুন করে আসামে কাউকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিপক্ষে। কিন্তু যাদেরকে অবৈধ বলা হচ্ছে, সেই অবৈধদের দাবি বিজেপি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলেও যুগের পর যুগ ধরে তারা আসামেই বাস করছে।

এদিকে বিজেপির মূল সংগঠন আরএসএস বরাবরের মতো রাজ্যে মুসলমান ভীতি ও ঘৃণা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় তারা উসকে দিচ্ছে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। নির্বাচনী পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। উল্লেখ্য, অতীতে বাংলা ও আসাম ছিল এক দেশ। বৃহৎ বঙ্গদেশের অংশ ছিল আসাম। ব্রহ্মপুত্রের একই উপত্যকায় তাদের চিরস্থায়ী অবস্থান। অথচ সেই আসাম ১৯ লাখ স্থানীয়কে 'বাংলাদেশি তকমা দিয়ে 'রাষ্ট্রবিহীন' করে রেখেছে।

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

LATIFI HANDS

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT
SADAQAH PROJECT

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands
www.latifihands.org.uk

আওরঙ্গজেবকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি

ড. মুহাম্মদ সিদ্দিক

হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করতে কোনো কোনো হিন্দু শাসকের অনৈতিক কার্যকলাপকে আড়াল করতে ইতিহাস বিকৃতি করে চলেছেন। একেই বলা যেতে পারে পুকুরচুরি। এটি একটি ভয়ঙ্কর খেলা। মুসলমানদের একজন প্রখ্যাত শাসক আওরঙ্গজেব আলমগীর সম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসবিদগণ মিথ্যাচারের আশঙ্কা করেছেন। তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ভালো মানুষ এই ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। পশ্চিমবঙ্গের সুরজিৎ দাশ গুপ্ত তার ভারতীয় মুসলমানদের সংকট (প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৯) গ্রন্থে মিথ্যাচারের সমালোচনা করে স্বচ্ছতার প্রকাশ করেছেন। মুসলমান শাসকরা যে দানব নন, আর হিন্দু শাসকরা যে সবাই দেবতা নন, তাই তিনি বলেছেন।

আওরঙ্গজেবকে নিয়ে মিথ্যাচার

সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেন, অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি'র ঐতিহাসিকরাও মন্তব্য করেছেন যে ঐতিহাসিকগণ মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মূল্য নিরূপণে বিশেষ রকম কঠিন সমস্যায় উত্তেজিত। তাঁরা ইঙ্গিত করেছেন যে, যেভাবে আওরঙ্গজেব দিল্লির মসনদ দখল করেন তা তাঁর প্রতি ঐতিহাসিকদের বিরূপ করে। কিন্তু বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর ইতিহাস প্রণয়নের সময় একই ঐতিহাসিকগণ ঘটনাবলিকে কোমল বর্ণে রঞ্জিত করেন। অজাতশত্রু শুধু পিতাকে হত্যাই করেননি, পিতার প্রিয় ধর্মকেও নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং কবির ভাষা সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার। পিতাকে বন্দী করে আওরঙ্গজেব কি অজাতশত্রুর চেয়েও অপরাধ করেছিলেন? একজন খাঁটি সুন্নী মুসলিম হিসেবেই তিনি মদ, ভাং ইত্যাদি নেশা নিষিদ্ধ করেছিলেন। বাইজিদের উপর হুকুম জারি করেছিলেন যে বিয়ে না করলে দেশ ছাড়তে হবে। অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করেছিলেন। সতীদাহ প্রথাও নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই সব আদেশ ও ফরমানের পেছনে যে মানসিকতা প্রকাশ পায় তাকে কি এক কথায় অন্যায় অথবা সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করা যায়? তিনি ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জিজিয়া কর প্রবর্তন করেছিলেন বলে নিন্দিত। নাগরিককে নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে শাসনকর্তা একটা কর আদায় করবেন মুসলমান হলে করটার নাম যাকাত আর অমুসলমান হলে জিজিয়া। এটাই শাসননীতি। মুসলমান কর দেবে আর ব্রাহ্মণ ছাড় পাবে আওরঙ্গজেব মুসলমান অমুসলমানের এই বিভেদটা তুলে দেওয়ার জন্যই জিজিয়া কর চালু করেছিলেন। কিন্তু এজন্যই পরবর্তী যুগের বহু ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন।

সুরজিৎ লেখেন, আওরঙ্গজেবের প্রতি আর একটা বড় অভিযোগ এই যে, তিনি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন। এটা সত্য যে তিনি একাধিক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও সত্য যে তিনি একাধিক হিন্দু মন্দির নির্মাণের জন্য অথবা পূর্ব নির্মিত মন্দিরের বিগ্রহের সেবা ও ভোগের জন্য জায়গীর দানের ফরমান জারী করেছিলেন। বারনসীতে তিনি শিব মন্দির ধ্বংস করেছিলেন এটা সর্বজনবিদিত, কিন্তু এই বারানসীতেই তিনি যে জঙ্গেমবাদী মঠের জন্য অর্থ ও ভূমি দান করেছিলেন তা গবেষক সমাজের বাইরে অজ্ঞাত। বলা হয় যে আওরঙ্গজেবের সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হল বারনসীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কাদের অনুরোধে বা দাবিতে তিনি এই বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ ড. পট্টভি সীতা রামাইয়া দিয়েছেন 'দি ফেদারস এন্ড দি স্টোনস' নামক গ্রন্থে। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই আওরঙ্গজেব যখন তাঁর দলবল নিয়ে বারানসীর কাছ দিয়ে বাংলার দিকে এগুচ্ছিলেন তখন তার বাহিনীর অভিজাত হিন্দুরা তাঁকে বলেন যে তিনি যদি সেখানে দু একদিন বিশ্রাম নেন তাহলে তাঁদের রাণীরা গঙ্গায় স্নান করে বিশ্বনাথ মন্দিরে পুঁজো দিতে পারেন। বাদশাহ রাজি হন। কিন্তু গঙ্গা স্নান করে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরে রাণীদের একজনকে পাওয়া গেল না। খবর পেয়েই আওরঙ্গজেব তাঁর কয়েকজন হিন্দু রাজাকে পাঠালেন নিখোঁজ রাণীর সন্ধানে। মন্দিরে ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে তারা নারী কণ্ঠের আর্তনাদের উৎস ধরে এক গণেশ মূর্তির পেছনে ওপ্ত সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেলেন। তারা ত্বরিতে গিয়ে সেই রাণীকে নিচের ওপ্ত কক্ষ থেকে উদ্ধার করলেন। স্বয়ং প্রভু বিশ্বনাথের বিগ্রহের ঠিক নিচেই ছিল সেই ওপ্ত কক্ষ। ক্ষুব্ধ রাজাদের দাবিতে আওরঙ্গজেব পবিত্র বিগ্রহ অপসারণ করে ওই অপবিত্র মন্দির চূর্ণ করার আদেশ দিলেন। বাদশাহের হুকুম তামিল হল। তখন কেউ ভাবেনি যে একশ বছর পরে এই ঘটনাটিকে আওরঙ্গজেবের হিন্দু বিদ্বেষের ও মন্দিরের ধ্বংস বৃত্তির অকাট্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং তিনি বিচূর্ণ মন্দিরের স্থানে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সেই মসজিদ ভেঙ্গে নতুন আরও একটি বিশ্বনাথ মন্দির নির্মাণের জন্য আন্দোলনের আহ্বান জানানো হবে। এটাও বলে রাখা ভালো যে, বিরুদ্ধ বা শত্রু পক্ষের উপর বিজয়ের চরম ঘোষণা হিসেবে সেই বিজিত এলাকার মন্দির বা মসজিদ ধ্বংস করা সে আমলে একটা প্রথা ছিল- সেই প্রথা থেকেই মহারাষ্ট্রীয়রাও বিজিতের ধর্মস্থান ধ্বংস করেছে এবং আওরঙ্গজেব গোলকোন্ডার তানাশাহর মসজিদ ধ্বংস করেছেন। (পৃ. ২০-২১)

বারা নসির বিশ্বনাথের মন্দিরে হিন্দু রাণীর উপর বলাৎকার হয়েছিল বলেই আওরঙ্গজেবের হিন্দু রাজা ও সেনাপতিগণ সেই অপবিত্র মন্দির ভাঙ্গার দাবি তোলেন। বাদশাহ তাদের দাবি মানাতে দোষী হয়ে গেলেন? মন্দিরে যে নারীদের নিয়ে এসব হয় তা তো ঠিক। দেবদাসীদের তো মন্দিরের গণিকা হিসেবে রাখা হতো। আওরঙ্গজেব বিশ্বনাথ মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করেনি তা সরিয়ে নেওয়া হয়। শুধু নারীর উপর বলাৎকারের জায়গা মন্দিরটিকে রাজাদের দাবি অনুযায়ী ধ্বংস করা হয়।

উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে

■ মারজান আহমদ চৌধুরী

সমরকন্দ আসার পথে আমাদের কর্মসূচীতে ছিল খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার (র.) এর কবর যিয়ারত। খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার ছিলেন 'তানাম ফারসুদা' কাসীদার বিখ্যাত কবি আবদুর রহমান জামী (র.) এর মুরশিদ। এ নিয়ে আমরা নকশবন্দী সিলসিলার মোট ৮ জন শায়খের কবর যিয়ারত করলাম।

সমরকন্দ শহরে প্রবেশ করার পূর্বে খরতংক গ্রামে আমরা ৪ ঘণ্টা বিরতি দিয়েছি। এ খরতংক গ্রামেই শুয়ে আছেন উম্মতে মুহাম্মাদীর জনম জনমের গর্ব, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস, ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগিরা ইবনে বারদিযবা আল-জুফী আল-বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। ১৯৪ হিজরির ১৩ই শাওয়াল তৎকালীন খোরাসানের বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইমাম বুখারী। ২৫৬ হিজরীতে ঈদ-উল-ফিতরের রাত সমরকন্দের খরতংক গ্রামে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। আল-জামি আস-সহীহ, যাকে আমরা সহীহ বুখারী বলি, সংকলন করে ইমাম বুখারী উম্মতে মুহাম্মদীর চোখের তাঁরা হয়ে আছেন। যুহরের নামায পড়ে বাইরে থেকে যিয়ারত করেছি। পরে ভারতের শায়খ সায়্যিদ তালহা কাসিমের সাথে একেবারে কবরের পাশে (ভেতরে) গিয়েছিলাম। সেখানে হাদীসের অমর গ্রন্থ সহীহ বুখারীর প্রথম ও শেষ হাদীসের দারস হয়েছিল। এরপর শায়খ আমাদেরকে নিয়ে দুআ করেছেন। আল্লাহর শপথ, ওই রূহানী অভিজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কতো অযুত-নিযুত শুকরিয়া আদায় করলে শুকরিয়া জ্ঞাপনের হক আদায় হবে, তা আমি জানিনা।

বুখারা, সমরকন্দ সংক্রান্ত আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। এই এলাকার শিশুরা দেখতে অনিন্দ্য সুন্দর, একদম পাঁকা আপেলের মতো। মনে হয় এইমাত্র কেঁদে ফেলবে। কাছে এসে মুসাফাহা করে। আমরা সাথে সাথে কোলে নিয়ে নেই। হাদিয়া দিতে চাইলেও নেয়না। ইংরেজি বা আরবি জানেনা, তাই কথা বলার সুযোগ নেই। খরতংক থেকে আমরা চললাম সমরকন্দ শহরের দিকে।

সমরকন্দ শহরকে বলা হয় Gem of the East বা প্রাচ্যের রত্ন। এটি কেবল কথার কথা নয়। সত্যিই এই শহরটি জীবন্ত রত্ন। খোঁড়া পায়ের বিশ্ববিজয়ী তৈমুর লং-এর শহর এ সমরকন্দ। শহরটি অনিন্দ্য সুন্দর। বুখারার চেয়েও সুন্দর। ২,৭৫০ বছরের পুরনো সমরকন্দ প্রত্যক্ষ করেছে ইতিহাসের নানা পট পরিবর্তন। সাক্ষী হয়েছে বিশ্ববিজয়ীদের উত্থান-পতনের। মুসলমানদের অগ্রাভিযানের সময় অনেক মুসলিম বীরের পদধূলিতেও ধন্য হয়েছে সমরকন্দের মাটি। এজন্যই সমরকন্দের সংস্কৃতিতে ইরানি, ভারতীয়, মঙ্গোলিয়সহ প্রাচ্য ও খানিকটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়া বিখ্যাত সিল্করোডের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রেও সমরকন্দের সংস্কৃতি সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিংবদন্তীতুল্য এই নগরী কতবার ধ্বংস, আর কতবার পুনর্জাগরণের সম্মুখীন হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এক শাসক সমরকন্দকে ধ্বংস করেছেন তো আরেক শাসক একে গড়েছেন। প্রতিবার শহরটি হয়ে উঠেছে আরো সুন্দর, আরো মনোরম। আজকের সমরকন্দকে প্রাচীনত্বের অনন্য আধার বলা যেতে পারে। সমরকন্দের গৌরবজ্জ্বল অতীত আর চোখধাঁধানো স্থাপত্যসম্ভার, সেই সাথে আধুনিক যুগের জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুসজ্জিত নগরায়নের ফলে এ শহরে আগমন ঘটেছে পর্যটকদের, কবিদের, ঐতিহাসিকদের। এ শহর সব ধরনের মানুষকে আকর্ষণ করার বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখে।

সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থান, অনুকূল জলবায়ু, প্রাকৃতিক ঝর্ণা ও সুস্বাদু পানির প্রাচুর্য, নিকটবর্তী পর্বতে খাবারের জন্য শিকারের সহজলভ্যতা এবং বিশেষত জারাফশান নদীর কারণে সমরকন্দে সেই প্রাচীন যুগেই বসতি স্থাপিত হয়েছিল। সমরকন্দ ঠিক কখন স্থাপিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে ধারণা করা হয়, এটি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতকে স্থাপিত হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৯ অব্দে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট সমরকন্দ জয় করেন। আলেকজান্ডারের আক্রমণের ফলে প্রাথমিকভাবে কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলেও গ্রিকদের তত্ত্বাবধানে দ্রুতই শহরটি সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে।

এরপর সমরকন্দ পারস্যের সাসানি সম্রাটদের হস্তগত হয়। মুসলিম বিশ্বে উমাইয়া শাসনামলে আরব মুসলমানরা বীর সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে সমরকন্দ অধিকার করেন। কুতাইবা ইবনে মুসলিম ছিলেন একজন তাবিঈ। এ সময়ে সমরকন্দ পরিণত হয় বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলনস্থলে। তবে অনেকেই আরবদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করেন। এরপর ১২২০ সালে সমরকন্দ দেখেছে চেঙ্গিস খানের নির্মম, নির্দয় ধ্বংসযজ্ঞ। তেজী ঘোড়া, শানিত তরবারি আর লেলিহান আগুনের শিখায় চেঙ্গিস খা ছিন্নভিন্ন করে ফেলে সাজানো গোছানো সমরকন্দ। ১৩৭০ সালে সমরকন্দ বিশ্ববিখ্যাত বীর তৈমুর লং-এর রাজধানীতে পরিণত হয়। তিনি সমরকন্দকে পুনর্নির্মাণ করেন এবং শহরটির সৌন্দর্যবর্ধন করেন। তৈমুর মানুষ হিসেবে নিষ্ঠুর ছিলেন সত্য, কিন্তু শিল্পের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও আকর্ষণ প্রশংসার দাবী রাখে। শৈল্পিক স্থাপত্য দিয়ে তিনি তাঁর রাজধানীকে সাজাতে কুণ্ঠিত হননি। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা সমরকন্দ শাসন করেন। তৈমুরের নাতি উলুগবেগ প্রায় ৪০ বছর সমরকন্দের শাসক ছিলেন।

তিনিই সম্ভবত সমরকন্দের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। চৌদ্দ থেকে পনের শতককে বলা যায় সমরকন্দের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এ সময় নগরীর বেশিরভাগ শক্তিশালী দুর্গ, রাস্তাঘাট, সুদৃশ্য গম্বুজ আচ্ছাদিত ভবন গড়ে ওঠে। ১৫১০ সালে উজবেকরা সমরকন্দ দখল করে। তারপর সমরকন্দ রাশিয়ান জারদের দখলে চলে যায়। ১৯৯১ সালে উজবেকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর এটি উজবেকিস্তানের ভেতরে এ আসে এবং ঐতিহাসিক এ নগরীটি উজবেকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সমরকন্দে আসতে রাত ঘনিয়ে গেল। সকালে উঠে প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম ইমাম আবূ মনসুর আল-মাতুরিদী (র.) এর কবর যিয়ারতে। ইমাম মাতুরিদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার ইমাম ছিলেন। হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা মূলত মাতুরিদী আকীদায় বিশ্বাসী। ৯৪৪ সালে ইমাম মাতুরিদী সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে এখানেই কবরস্থ করা হয়।

ওখান থেকে গেলাম উলুগবেগ অবজার্ভেটরিতে। সম্রাট তৈমুরের নাতি মির্জা উলুগবেগ (১৩৯৪-১৪৪৯) একইসাথে একজন শাসক, মহাকাশবিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ ছিলেন। ১৪২০ সালের দিকে তিনি মধ্য এশিয়ার প্রথম অবজার্ভেটরি (মানমন্দির) তৈরি করেছিলেন। ভেতরে গিয়ে দেখি একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড! হাতে লেখা গাণিতিক যুক্তিতর্কের বই-পুস্তক থেকে শুরু করে গ্রহ-নক্ষত্র অবলোকন করার জন্য মেরিডিয়ান আর্ক তৈরি করা হয়েছে। ওখানকার মিউজিয়ামে মির্জা উলুগবেগের নিজের হাতে লেখা একটি বই দেখেছি, যেখানে তিনি ১০১৮টি তারকার অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে লিখে রেখেছেন। বিষয়টি সহজে হজম করার মতো নয়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, কোপারনিকাস প্রমুখ যখন জ্ঞানের দুনিয়া কাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন মুসলিম বিজ্ঞানীরাও নিজেদের সগর্ব পদচিহ্ন পৃথিবীপৃষ্ঠে অঙ্কন করেছেন। সে পদচিহ্ন আজও ইতিহাসের পাতায় পাতায় জাজ্বল্যমান।

এরপর গেলাম উজবেকিস্তানের জাতীয় বীর, খোঁড়া পায়ের বিশ্ববিজয়ী সেনাপতি তৈমুর লং-এর (১৩৩৬-১৪০৫) সমাধিসৌধ গোর-এ-আমিরে। গোর-এ-আমির তৈমুর লং এবং তাঁর উত্তরসূরীদের কবরের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ। প্রথমদিকে এটি ছিল তৈমুরের নাতি মুহাম্মাদ সুলতানের মাদরাসা। তার মৃত্যুর পর শোকাহত তৈমুর নাতির মৃতদেহকে মাদরাসার এককোণে সমাহিত করেন এবং তার ওপর তিসৌধ নির্মাণ করেন। পরে তৈমুর, তৈমুরের দুই পুত্র এবং নাতি উলুগবেগকেও এখানে শায়িত করা হয়। স্মৃতিসৌধের উজ্জ্বল নীল গম্বুজ এবং নীল টাইলসের কারুকার্য সত্যি আকর্ষণীয়।

উজবেকরা তৈমুরকে সম্মান করে 'এমির তিমুর' নামে ডাকে। কিছুটা ক্ষ্যাপাটে, প্রচণ্ড দুর্ধর্ষ এই তুর্কী-মোঙ্গল সেনাপতি মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তাঁর সম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তুর্কী-মোঙ্গল সেনাধ্যক্ষ তৈমুর লং ছিলেন তিমুরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৭০ থেকে ১৪০৫ সাল পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ বছর ছিলো তাঁর রাজত্ব। আজকের দিনের তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, ইরান থেকে মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ অংশ তথা কাজাখস্তান, আফগানিস্তান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, ভারত, এমনকি চীনের কাশগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৩৬০ সালে তৈমুর সেনা অধ্যক্ষ হিসেবে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তিতে ১৩৬৯ সালে সমরকন্দের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৩৯৮ সালে তৈমুর দিল্লি সুলতানাত আক্রমণ করেন এবং মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে দিল্লি জয় করেন। এখানে তিনি এক লক্ষ যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করেন। তিনি অটোমান সাম্রাজ্য, মিশর, সিরিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রমুখ দেশেও সামরিক অভিযান চালান। সব জায়গাতেই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় ও অনেক জনপদ বিরান করে ফেলা হয়। তাঁর সেনারা যে স্থানই জয় করত সেখানেই ধ্বংসযজ্ঞের প্রলয় তুলত।

এরপর আমরা গেলাম উজবেকিস্তানের শাহে যিন্দাখ্যাত মুকুটহীন বাদশা, প্রখ্যাত সাহাবি সায়্যিদুনা কুসাম ইবনে আব্বাস (قثم بن العباس) (রা.) এর যিয়ারতে। কুসাম ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন আহলে বায়তের একজন সদস্য। তিনি রাসূলুল্লাহ e এর চাচাতো ভাই। তাঁর চেহারা ও আখলাক ছিল রাসূলুল্লাহ e এর চেহারা ও আখলালের অনুকরণে। তিনি আল্লাহর নবী e -কে গোসল দিয়েছিলেন এবং কবর শরীফে নামিয়েছিলেন। তাবিঈ কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নেতৃত্বে ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি এই দূরদেশে এসেছিলেন আল্লাহর দ্বীন কায়িম করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তাঁর ত্যাগকে কবূল করেছেন। তিনি যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

উমাইয়া শাসনামলে ৮৬ হিজরিতে কুতাইবা ইবনে মুসলিমকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ৮৯ হিজরিতে কুতাইবা বুখারার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি আমুদরিয়া অতিক্রম করেন। সিফলি অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর সাথে তাঁর লড়াই হয়। কুতাইবা এই বাহিনীকে পরাজিত করে বুখারায় পৌঁছেন। বুখারায় প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টায় কুতাইবা বুখারা বিজয় করেন। ৯৩ হিজরিতে কুতাইবা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে খাওয়ারিজমের শাসক মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়। যুদ্ধ ছাড়াই এ অঞ্চল মুসলমানদের হাতে আসে। এরপর কুতাইবা সমরকন্দ বিজয়ের ইচ্ছা করেন। প্রথমে তিনি তাঁর ভাই আবদুর রহমানকে সমরকন্দে প্রেরণ করেন। কয়েকদিন পর একটি বাহিনী নিয়ে তিনিও সমরকন্দের পথে রওনা হন। শহরবাসী মুসলিম বাহিনীর দেখা পেয়ে শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়। তারা কেল্লাবন্দী হয়ে বসে থাকে। মুসলিম বাহিনী প্রায় এক মাস শহর অবরোধ করে রাখে। শহরবাসী পত্র মারফত চীন ও ফারগানার শাসকের সাহায্য কামনা করে। পত্র পেয়ে আশপাশের শাসকরা সমরকন্দের সাহায্যে এগিয়ে আসে। চীন সম্রাট তার পুত্রকে বিশাল বাহিনী দিয়ে কুতাইবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কুতাইবা এ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সালেহ ইবনে মুসলিমের নেতৃত্বে ৬০০ সেনার একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। মধ্যরাতে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের ওপর গেরিলা হামলা চালায়। আচমকা আক্রমণের জন্য শত্রুরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। রাতের আচমকা হামলার ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা ঘুরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পালাতে থাকে। এদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে সমরকন্দবাসীর মনোবল ভেঙে যায়। এদিকে কুতাইবা তখন মিনজানিকের মাধ্যমে শহরের প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করছিলেন। শহরের প্রাচীরের একাংশ ভেঙে যায়। বাধ্য হয়ে শহরের বাসিন্দারা আত্মসমর্পণ করে।

এরপর আমরা গিয়েছিলাম বিশ্বখ্যাত রেগিস্তান স্কয়ারে। রেগিস্তান স্কয়ার সমরকন্দ শহরের একদম কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রাচ্যের চমৎকার স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন হিসেবে এর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। এ চত্বরটির তিনপাশে রয়েছে কেন্দ্রের দিকে মুখ করা তিনটি মাদরাসা। মাদরাসাগুলোর দু'পাশে নীল রঙের সুদৃশ্য উঁচু মিনার। তৈমুরি বংশের শাসনামলে তৈরি করা তিনটি মাদরাসার সমন্বয়ে এ জায়গাটি পৃথিবীর অন্যতম মনোমুগ্ধকর স্থান। ভবনের ছাদে থাকা দৃষ্টিনন্দন নীল মিনার সহজেই পর্যটকের দৃষ্টি কাড়ে। অনন্যসাধারণ এ স্থাপত্যের নির্মাণশৈলী দেখে প্রাচীন নির্মাতাদের প্রতি নিজের অজান্তেই মনের ভেতর গভীর শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্থাপত্যশৈলীর কারণে ২০০১ সালে ইউনেস্কো রেগিস্তান চত্বরকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' বলে ঘোষণা করে।

'রেগিস্তান' শব্দের অর্থ বালুময় প্রান্তর। এক সময় এখানে ভবনবেষ্টিত চত্বর ছিল না, ছিল খোলা মাঠ। রাজকীয় ফরমান শোনার জন্য আগে এখানে লোকজন জমায়েত হতো। যেকোনো জাতীয় উৎসবও পালন করা হতো এ চত্বরে। আজকের উজবেকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নে পরিণত হয়েছে রেগিস্তান স্কয়ার। নিজের চোখ না দেখলে এ চত্বরের সৌন্দর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

مدرسة دار الإحسان اللطيفية لتحفيظ القرآن ، سلهت

দারুল ইহ্সান লতিফিয়া হিফজুল কোরআন মাদরাসা

বি # ব্লক, মেইন রোড, বাসা নং # ১৩, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।
মোবাঃ ০১৭৩৮-৮২৫০২৭ (অফিস), e-mail: darulihsansylhet@gmail.com

আবাসিক | অনাবাসিক | ডে-কেয়ার

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শী ইসলামী ভাবধারা ও সুন্নতে নববীর আদর্শে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।
- ইয়াকুবিয়া হিফজুল কুরআন বোর্ডের অধীনে পরিচালিত ও হুফফাজে প্রশিক্ষণ এবং সনদপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে হিফজ সম্পন্নের প্রচেষ্টা।
- আন্তর্জাতিক মানের হিফজের পাশাপাশি বয়স অনুপাতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা।
- গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা-পড়ার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাপ্তাহিক সেমিনার, ইসলামি সংস্কৃতির চর্চা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, প্রতিযোগিতা ও শিক্ষাসফর সহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্কুল/অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আগত দুর্বল ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা।
- মানসম্পন্ন খাবার ও আবাসন ব্যবস্থা।

ভর্তি চলছে

- হিফজ বিভাগ
- হিফজ রিভিশন
- নাজারা বিভাগ
- সাবাহি মক্তব
- ইভেনিং কোর্স

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগাঃ (প্রধান শিক্ষক) ০১৭৫১-১৪৮৮২১

দালাইলুল খাইরাত

মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

প্রিয়নবী ﷺ এর উপর দুরূদ শরীফের সব থেকে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো দালাইলুল খাইরাত। এর পূর্ণাঙ্গ নাম দালাইলুল খাইরাত ওয়া শাওয়ারিকুল আনওয়ার ফী-যিকরিস সালাতি আলান নাবিয়্যিল মুখতার। কিতাবটি রচনা করেছেন শাযূলীয়া তরীকার বিখ্যাত সূফী আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু সুলায়মান আল-জাযূলী (র.) (জন্ম: ৮০৭ হি., ওফাত: ৮৭০ হি.)। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন।

এ কিতাব রচনার কারণ হলো, ইমাম জাযূলী (র.) ফাস শহরে অবস্থান করছিলেন। নামাযের সময় উপস্থিত হলে তিনি উযূ করার জন্য একটি কুয়ার পাশে গেলেন। কিন্তু পানি অনেক নিচে ছিল যা হাত দিয়ে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, আবার তিনি আশ-পাশ খোঁজাখোজি করে এমন কোনো কিছুই পেলেন না যা দিয়ে তিনি পানি উত্তোলন করবেন। তিনি কিছুটা অস্থির হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন একজন বালিকা উঁচু ভূমি থেকে তার দিকে আসছে। কাছে এসে পরিচয় জানতে চাইল। ইমাম জাযূলী তার পরিচয় দিলেন। জাযূলীকে চেনার পর বালিকাটি বললো, লোকজন আপনার এতো প্রশংসা করে অথচ আপনি একটি কুয়া থেকে পানি তুলতে পারছেন না। তখন বালিকা কুয়ার মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে কুয়ার পানি উপরে উঠে এলো। শায়খ জাযূলী উযূ করে বালিকার কাছে জানতে চাইলেন তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আমাকে বলো, তুমি এই সম্মান কীভাবে অর্জন করলে? বালিকা বললেন, জন-মানবহীন প্রান্তরে পথ চলার সময় বন্যপ্রাণীরা যার পিছু পিছু আসত তার প্রতি বেশি বেশি দুরূদ পাঠের মাধ্যমে। বালিকার মুখে মনোমুগ্ধকর এমন কথা শুনে ইমাম জাযূলী (র.) এর মনে দুরূদ শরীফের প্রতি নতুনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তিনি দুরূদ শরীফ সংকলনের নিয়ত করলেন এবং কিতাব আকারে সন্নিবেশিত করেন।

ইমাম জাযূলী (র.) দালাইলুল খাইরাত কিতাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন দুরূদ, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, সালফে সালিহীনের পঠিত দুরূদ শরীফগুলো সংকলন করেছেন। এর বাইরে তিনি নিজে প্রিয়নবী ﷺ এর শান-মান, প্রশংসায় পরিপূর্ণ আরবী সাহিত্যের বালাগাত-ফাসাহাত সমৃদ্ধ উচ্চ মার্গীয় শব্দমালা দ্বারা অসংখ্য দুরূদ রচনা করেছেন।

ইমাম জাযূলী (র.) তার কিতাবটি আট অংশে বিভক্ত। সোমবার থেকে প্রথম অংশ শুরু করতে হয়। এভাবে সাত দিনের জন্য সাত অংশ নির্ধারিত। অষ্টম অংশকে তরীকার শাইখদের নিয়ম অনুযায়ী কেউ রবিবারের সাথে আবার কেউ সোমবারের সাথে পাঠ করেন। প্রাত্যহিক ওযীফা পাঠের পূর্বে আল আসমাউল হুসনা, আসমাউন নবী, দুআয়ে ইফতিতাহ পাঠ করতে হয়। কিতাবের শেষে ইমাম জাযূলী (র.) এর লিখিত দুরূদ শরীফের ওসীলা নিয়ে একটি দুআ সন্নিবেশিত রয়েছে। পূর্ণ ওযীফা খতমের পর এই দুআ পাঠ করতে হয়। শাযুলিয়া তরীকার শায়খগণ দালাইলুল খাইরাতকে দুই দিনে খতম করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

দালাইলুল খাইরাত কিতাবটি মহান আল্লাহর দরবারে এতটাই মকবূল যে, পৃথিবীর প্রায় সকল তরীকার অনুসারীরা এ কিতাবটি গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত করে থাকে। বিশেষত শাযুলিয়া তরীকায় এ কিতাবকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। মরক্কোর বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ আব্দুল্লাহ আত-তালিদী (র.) বলেন, পূর্ব থেকে পশ্চিমে লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ কিতাবটি যাচাই করেছেন, এর কল্যাণ এবং উপকারিতা বহু শতাব্দি থেকে পরীক্ষিত। 'আন নিআমুল জালাইল' কিতাবে উল্লেখিত আছে, "নেককার বুযুর্গগণ কর্তৃক পরীক্ষিত যে, দালাইলুল খাইরাত পাঠের মাধ্যমে অভূত কল্যাণ লাভ হয়, সফলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়, প্রিয়নবী ﷺ এর দীদার নসীব হয়ে থাকে"। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের তরীকা তাসাওউফের সাথে দালাইলুল খাইরাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেওবন্দী ধারার তরীকা তাসাওউফেও এ কিতাবকে ওযীফা হিসেবে পাঠ করা হয়। দেওবন্দী ধারার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও মুহাদ্দিস সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী তার 'আশ-শিহাবুস সাকিব' কিতাবে লেখেন "দালাইলুল খাইরাত আমাদের বুযুর্গদের ওযীফা"। এ ধারার অন্যতম বুযুর্গ মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ছাহেব দালাইলুল খাইরাত তিলাওয়াতের ইজাযত সম্বলিত সনদ প্রদান করতেন। (তাযকিরাতুর রশীদ)

শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁর উস্তায হযরত মাওলানা খলীলুল্লাহ রামপুরী (র.) এবং তাঁর পীর ও মুরশিদ হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) থেকে এ কিতাবের ইজাযত ও সনদ লাভ করেছিলেন। তিনি বহু মানুষকে ইজাযত ও সনদ প্রদান করে গেছেন। সম্প্রতি মুরশিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী তিন হাজারের অধিক মুরীদীন মুহিব্বীনকে এ কিতাবের সনদ প্রদান করেছেন।

পৃথিবীর প্রসিদ্ধ অনেক আলিমে দ্বীন বুযুর্গ এ অনবদ্য কিতাবটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো আবূ যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল ফাসী (র.) এর 'আল আনওয়ারুল লামিআত ফিল কালামি আলা দালাইলিল খাইরাত', মুহাম্মদ আল মাহদী আল ফাসী (র.) এর 'মাতালিউল মাসাররাত বি জালাই দালাইলিল খাইরাত' শায়খ ইউসুফ নাবহানীর 'আদ-দালালাতুল ওয়াদ্বিহাত আলা দালাইলিল খাইরাত', শায়খ আব্দুল মাজিদ আশ শারনুবী আযহারীর 'শারহু দালাইলিল খাইরাত'। এগুলোর মধ্যে আল্লামা মুহাম্মদ আল মাহদী ফাসীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি এই কিতাব ছাড়াও দালাইলুল খাইরাতের উপর আরো দুটি কিতাব লিখেছেন।

দালাইলুল খাইরাত কিতাবটি অসংখ্য কল্যাণ এবং বরকতময় দুরূদকে একিভূত করেছে। এ কিতাব সম্পর্কে আল্লামা ফাসী (র.) বলেন, দালাইলুল খাইরাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার অনেক বান্দাহকে উপকৃত করেছেন। এ কিতাবটি এতো গ্রহণযোগ্য হয়েছে যে, দূর-দূরান্তের দেশগুলোতেও এ কিতাব পৌঁছেছে, গ্রামে কিংবা শহরে সবখানেই এ কিতাব প্রসিদ্ধ। লোকজন এই কিতাবের প্রতি এতো বেশি ঝুঁকেছে দুরূদ শরীফের অন্য কোনো কিতাবের প্রতি এরূপ হয়নি।

পরিবারে নারীর ভূমিকা

সৈয়দা রাজিয়া সুলতানা

আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বে কোনো কিছুই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছে অগণিত সৌন্দর্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা বিশ্বে যা কিছু দিয়েছেন তার প্রতিটির প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সুন্দর পরিকল্পনা ও শাশ্বত চিরসুন্দর সম্পর্ক।

এই বিশাল আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজ্য, গাছ-পালা, নদ-নদী, পশু, পাখি সবকিছুই তৈরি করেছেন তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন নিজের ইবাদতের জন্য। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে- "পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছি সবই মানুষের প্রয়োজনে। আর মানুষ সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করবে এবং সৎপথে থেকে সঠিকভাবে দুনিয়াদারিও করবে।"

আল্লাহ তাআলা বাবা আদম (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি সঙ্গী করে সঙ্গদানকারী মা হাওয়াকে পাঠিয়েছেন। সৃষ্টি হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেমময় দায়িত্বশীল মহৎ সম্পর্ক। তৈরি হয়েছে আরো অনেক সম্পর্ক যেমন মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ইত্যাদি।

একজন মহিলা সংসারে বিভিন্ন রূপে নিজেকে পরিচালিত করেন এবং অপরিহার্যভাবে তা করতে হয়। যেমন একটি সংসারে একজন মহিলা একই সঙ্গে স্ত্রী, মা, বোন, ভাবী, মামী, চাচী, দাদী ইত্যাদি সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। আর সম্পর্কগুলোকে পরিকল্পিতভাবে দায়িত্বের সঙ্গে পরিচালনা করে টিকিয়ে রাখার গুরুভারও ঐ ঘরের মহিলাটির উপর।

দুদিনের এই দুনিয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চন্দ্র সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি জটিল এবং গভীর প্রেমময় মধুরও। এই মধুর সম্পর্ককে আরো সুন্দর সুখময় করে তোলার জন্য ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়কেই ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে হৃদয়গত ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করলে ঘরের মধ্যে একজন মহিলার দায়িত্বই বেশি। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকারকে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে- নারীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করা হয়েছে বার বার। তবে দাম্পত্য জীবন বা ঘরই হচ্ছে সামাজিক জীবন সম্প্রসারণের শেকড়। এই ঘরকে সুন্দর স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে দরকার পরস্পর সহনশীলতার মনোভাবে উজ্জীবিত হওয়া এবং একে অপরকে সমঝোতার মধ্যে আপন ও অপরিহার্য বিবেচনা করা। একজন মহিলা তার শালীন আচার-আচরণ দায়িত্ব কর্তব্যে নিষ্ঠাবান হয়ে ঘরকে গড়ে তুলতে পারেন স্বর্গরাজ্য রূপে।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জীবন এমন একটি বন্ধনে আবদ্ধ যে, এই বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবন কাটাতে হয়। তাই প্রথম থেকে একে অপরকে ভালোভাবে বুঝে ও চিনে নিতে হবে; বিশেষত মহিলাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, সে সর্বদা আপন স্বামীর মন-মর্জি অবস্থা বুঝে চলবে নতুবা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধী হতে হবে, ঘর সংসারে অশান্তি দেখা দেবে। আর তাই প্রত্যেক মহিলা বা স্ত্রীলোকের উচিৎ সংসার জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই খুব সাবধানে চলাফেরা করে স্বামীর মনোভাব সম্পর্কে জেনে নেওয়া। যদি স্বামীর আচার-আচরণ ইসলামসম্মত হয় তার মর্জি অনুযায়ী চলে হৃদয় জয় করা যায় তবে পরকালে যেমন শান্তি পাওয়া যাবে তেমনি ঘরেও শান্তি বজায় থাকবে।

প্রত্যেক মহিলার উচিত এবং দায়িত্ব তার গৃহের প্রত্যেকটি বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ঘরের কর্তার বিনা হুকুমে কোনো কিছু নষ্ট করবে না বা অপচয় করবে না। সকল জিনিসপত্র নিজের চেষ্টায় পরিশ্রমে সংরক্ষণ করে রাখবে।

সন্তানদের প্রতি মায়ের দায়িত্ব

প্রত্যেক বাবা-মার কাছে সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে সন্তান। এই সন্তানের মধ্যেই মানুষ যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। তবে এখানে কথা আছে- সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সন্তান এর আরেক নাম নন্দন। নন্দন শব্দের অর্থ হচ্ছে- নয়নে আনন্দ দান করে যা। সন্তানকে বাবা-মা আদর করে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য নয়। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে- ছোট শিশুটিকে কোলে তুলে নিলে কতো যে ভালো লাগে। এই চেতন অবচেতন মনের ভালো লাগাটুকুই সন্তানের জন্য বাবা মায়ের নন্দিত আনন্দ। আর এই সন্তানকে যদি লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক সব দিকগুলো যেমন আদব-কায়দা, সহনশীলতা, মিতব্যয়ীতা, সদাচরণ ইত্যাদি বিভিন্ন শালীন ও পরিশীলীত দিকগুলি তার মধ্যে পরিবেষ্টিত করে গড়ে তুলে পরিবেশ ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় তবেই মা-বাবা নিজেকে পরিতৃপ্ত ভাবতে পারেন এবং তা-ই সার্বিক দিক থেকে মঙ্গলজনক হবে। তবে একটি শিশুকে ক্রমান্বয়ে বড় করে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের যেমন দায়িত্ব আছে পাশাপাশি বাবাকেও সময় অনুযায়ী সন্তানের প্রতি যথার্থ খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে মা-বাবা উভয়ের মিলিত স্নেহে ও যত্নে একটি শিশু বড় হয়ে সুসন্তান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

তাই বলা চলে একজন দায়িত্বশীল মা-বাবাই পারেন সমাজকে, দেশকে একজন সুসন্তান উপহার দিতে।

সকল মা-বোনদের উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ বলেছেন- "যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রামাদান মাসে রোযা রাখবে, পর্দা নীতি পালন করে চলবে এবং রীতিমতো সন্তান পালন, মুরব্বীভক্ত ও গৃহস্থালির রক্ষণাবেক্ষণ করে স্বামীর সঠিক খিদমত করবে, বেহেশতের যে দরজা দিয়ে সে ইচ্ছা করবে, সে দরজা দিয়ে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করার অধিকার দান করা হবে।"

উপরের কথাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ হুকুম মেনে চললে একজন নারী বা মহিলা ঘরকে যেমন সুন্দর করে রাখতে পারেন নিজের পরকালের পথও তেমনি সুন্দর প্রশস্ত ও শান্তিময় করতে পারেন। সত্যিকারভাবে অতীত ইতিহাস বলে নারী ও পুরুষের শ্রমে এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহমর্মিতা সমঝোতার মাধ্যমেই মানব সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

নারীর ঘর-সংসার

সভ্যতার সূচনা হয়েছে সুন্দরের হাত ধরে। এই সুন্দরের প্রকাশ একজন মানুষের জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিস্তৃতভাবে। 'ঘর' হচ্ছে মানুষের বিশাল জীবন ব্যবস্থার প্রথম ধাপ। এই ঘরকে মনের ঔদার্য দিয়ে চোখের দীপ্তি দিয়ে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে যে যতোখানি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পেরেছে। সেই হয়েছে সফল গৃহিণী, নন্দিত গৃহবধূ।

একজন গৃহিনীই পারেন ঘরের জিনিসপত্র যত্ন করে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে। ঘরের প্রতিটি জিনিসপত্র ধুয়ে মুছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রেখে রুচিসম্মতভাবে ঘরকে সাজানো গোছানো একজন গৃহকর্ত্রী বা মহিলার বিশেষ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যে যতো বেশি নিপুন হাতে পালন করতে পেরেছেন সেই হয়েছেন ততো বেশি পরিশিলিত পরিপূর্ণ গৃহকর্ত্রী।

এরপর ঘরে যে জিনিসটি বিশেষভাবে একজন মহিলাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে রান্না-বান্না। খাবার হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রথম একটি। মানব সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই খাবারের প্রয়োজন রান্না-বান্নার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। সময়ের সিড়ি বেয়ে সভ্যতা এগিয়েছে। ক্রমে রান্নায় এসেছে বৈচিত্র।

বিভিন্ন সময় নতুন নতুন জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রকমারি রান্না-বান্না হচ্ছে একটি বিশেষ রুচিসম্মত জীবনপ্রণালি। 'রন্ধন' সভ্যতার একটি অঙ্গ এবং কলা বিদ্যার অন্তর্গত। কাজেই রান্নায় সিদ্ধহস্ত নিঃসন্দেহে সম্মান ও গৌরেবর কাজ। প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকে। মহিলাদের বিশেষ স্থানগুলোর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে 'রান্নাঘর' 'রান্না-বান্না'।

অনেকেই আছেন নিজের হাতে রান্না করে মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করেন। আর প্রিয়জনকে মনের মতো রকমারি রান্না করে সামনে বসে খাওয়াতে যে কোনো একজন নারী বিশেষ করে বাঙালি মহিলা বধূরা খুবই পছন্দ করেন। সত্যি বলতে একজন নারী বা মহিলা স্বহস্তে স্বযত্নে প্রস্তুত করা খাদ্য সস্নেহে সহাস্যে পরিবেশন করতে গিয়ে তাদের অন্তরের মাধুর্য সেখানে অকৃপণ হস্তে অনেক খানিই ঢেলে দেন। তবে রান্না করার আগে কিছু নিয়ম যা জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন-

১. সহজলভ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য কোনটি লক্ষ্য রাখা: আমাদের উন্নয়নশীল দেশে স্বল্প আয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে কমদামি খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণের পরামর্শ দিতে হবে আর তা লক্ষ্য রেখে গৃহিণীকে রান্নার আয়োজন করতে হবে। অনেকে দামি খাবারকে পুষ্টিকর খাবার ভেবে থাকেন কিন্তু তা ভুল। যথা- চিকন চাল বা পাউরুটির চেয়ে মোটা চাল বা আটার রুটি দামে সস্তা কিন্তু খাদ্যমান দেহে একই রকম কাজ করে। তেমনি ছোট মাছ বিভিন্ন রকম ডাল, সীমের বিচি, বাদাম, শাকসবজি ইত্যাদি সস্তা ও সহজলভ্য। এগুলো সবই স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। কাজেই গৃহিণীকে এসব লক্ষ্য রেখে রান্না করতে হবে।

২. সুষ্ঠু রন্ধন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান: খাদ্য উপাদান অবিকৃত রেখে যথাযথ পুষ্টি লাভ করতে হলে রান্নার সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে গৃহিণীকে জানতে হবে এবং সচেতন হতে হবে। সব সময় শাকসবজি ধুয়ে কাটতে হবে। রান্নায় কম পানি ব্যবহার করে ঢেকে রান্না করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল মশলা ব্যবহার করা যাবে না। কারণ অতিরিক্ত তৈল ও মশলা থেকে নানা রকম রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

৩. সর্বোপরি সুষম খাদ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে: যে খাদ্য তালিকায় পরিমিত পরিমাণে সকল খাদ্য উপাদান উপস্থিত থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। কে কতটুকু কোন খাদ্য উপাদান গ্রহণ করবে তা নির্ভর করবে বয়স ও কাজের উপর। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত যার মাঝে সুষম খাদ্যের ৬টি উপাদান বিদ্যমান থাকবে। মোটামুটি শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি এ কয়টি উপাদান সম্বলিত খাবার নিয়মিত খেতে হবে।

এমনভাবে বিভিন্ন দিক লক্ষ্য রেখে রান্না করতে হবে এবং তা একমাত্র সচেতন গৃহিণীর দ্বারাই সম্ভব। তবে সামর্থ অনুযায়ী ভালো খাবার যেমন ডিম, গোশত, মিষ্টি, মৌসুমের ফল-ফলাদি ইত্যাদি কিনে প্রয়োজনমতো খাওয়া উচিত।

তৃপ্তির সঙ্গে প্রীতি লাভের ফলে জীবন যাত্রার পথ অনেকখানি সুগম হতে পারে, কোমল ও মধুর হয়ে উঠতে পারে পরিবারের সকল দিক। কাজেই রান্না বান্না একজন নারীর জীবনের বিশেষ দিক। নারী পুরুষের মানসিক সম্মেলনে ঘর হয় সুন্দর সমৃদ্ধ। আমার মনে হয়, প্রত্যেক পুরুষ নারীকে দেখতে চান স্নিগ্ধ মূর্তি কোমলমতি রূপে, যার সুব্যবহার সিদ্ধহস্তের ছোঁয়ায় প্রতিটি গৃহের ভাণ্ডার হবে আশীর্বাদের ভাণ্ডার।

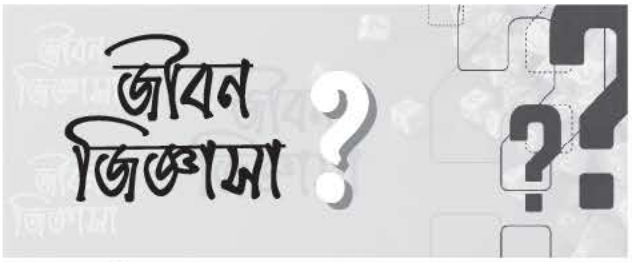

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

বদরুল ইসলাম
ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন-১: পীর বা মুরশিদ কেন মানতে হবে? পীর বা মুরশিদ পরকালে কোনো সুপারিশ বা উপকার করতে পারবে কি?

জবাব: আত্মার পরিশুদ্ধিতা অর্জন করার জন্য যে সকল সালিহ তথা নেককার জ্ঞানী ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক কিংবা শিক্ষকরূপে মান্য করা হয় তাদের পীর কিংবা মুরশিদ বা শাইখ বলা হয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে আত্মার পরিশুদ্ধিতার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তেমনি আত্মা-পরিশুদ্ধ ব্যক্তির অনুসরণ করার তাকীদ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ -যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ কর। (সূরা লুকমান, আয়াত-১৫)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

-হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১১৯)

মহান আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন, مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

-আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে ওলী (সাহায্যকারী) মুরশিদ (পথপ্রদর্শক) পাবেন না। (সূরা কাহফ, আয়াত-১৭)

হযরত খিযির (আ.) এর সান্নিধ্যে মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا– قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

-অতঃপর তারা আমার বান্দাহদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। মূসা (আ.) তাকে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন। (সূরা কাহফ, আয়াত-৬৫, ৬৬)

পবিত্র কুরআন মাজীদে একদল মানুষকে ওলী, আউলিয়া, মুরশিদ, সালিহীন, সাদিকীন, মুত্তাকীন, মুতাওয়াস্‌সিমীন ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তাঁরাই পীর, ওলী বা শাইখে তরীকত নামে আখ্যায়িত। সুতরাং তাদের অনুসরণ বা মান্য করা কুরআন শরীফের নির্দেশনা মানার'ই নামান্তর।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম একটি প্রকার হচ্ছে ইলমে মারিফাত, যাকে ইলমে তাসাওউফ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ইলমে শরীয়ত অর্জনের জন্য যেমন শিক্ষাগুরুর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন তদ্রুপ ইলমে মারিফাত অর্জনের জন্য কামিল হক্কানী পীরের (ওলী, শায়খ) শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। হাদীসের কতিপয় বর্ণনায় রয়েছে সাহাবায়ে কিরামের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট থেকে উভয় বিদ্যা অর্জন করেছেন। সে ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত হক্কানী ওলীদের সংস্পর্শে উম্মতে মুসলিমাহ ইলমে মারিফাত অন্বেষণ করে আসছে। কেননা তারা হচ্ছেন প্রিয় নবী ﷺ এর পূর্ণ ওয়ারিস।

আল্লাহর প্রিয় নেককার বান্দাগণের মর্যাদার স্তর অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাআলা তাদের অনেককে পরকালে সুপারিশ করার মর্যাদা প্রদান করবেন। ফলে তারা উক্ত মর্যাদা লাভে ধন্য হবেন এবং অনুসারীগণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী সুপারিশ করবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে,

وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ

-(আল্লাহর নেক বান্দাহরা) যখন দেখবেন তারা মুক্তি পেয়ে গেলেন তখন তারা তাদের মুমিন ভাইদের জন্য (যারা জাহান্নামী) আল্লাহর কাছে আবেদন করবেন, "হে আমাদের রব! তারা আমাদের সাথে নামায আদায় করেছে, সিয়াম পালন করেছে, আমাদের সাথে নেক আমল করেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে এক দিনার পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের করে নিয়ে এসো।"

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, নেককারগণ সুপারিশ করবেন এবং তাদের সুপারিশে অন্যরা উপকৃত হবেন।

শেখ আব্দুল মুমিন
ঘড়গাও, পৃথিমপাশা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন-১: স্বপ্নের মধ্যে খতনা হয়ে গেলে পরে আর খতনা করতে হবে কি না? কেউ কেউ বলে থাকেন এক্ষেত্রে খতনা দানকারীর যন্ত্র দ্বারা স্পর্শ করলেই হয়ে যায়। এটা কতটুকু সঠিক?

প্রশ্ন-২: এক চোখ অন্ধ লোকের পিছনে ইকফতদা করা যাবে কী?

জবাব-১: স্বপ্নযোগে কিংবা জন্মগতভাবে কারো খতনা হয়ে গেলে এবং সে খতনা বাস্তব খতনার মতো সম্পন্ন হয়ে থাকলে খতনা হিসেবে তা যথেষ্ট। এক্ষেত্রে পুনরায় খতনা করার কিংবা যন্ত্র স্পর্শ করানোর প্রয়োজন নেই। এটাই অধিকাংশ মনীষীগণের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত। অবশ্য কেউ কেউ এক্ষেত্রে (কোনো কর্তন ব্যতিত) শুধু যন্ত্রের স্পর্শ করানোকে উত্তম বলেছেন। তারা অন্য একটি বিধানের উপর কিয়াস করে এ রায় দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, যার মাথায় কোনো চুল নেই এমন ব্যক্তির হজ্জ কিংবা ওমরাহ এর ইহরাম থেকে হালাল

হওয়ার ক্ষেত্রে তার মাথায় যন্ত্র চালানোর বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের সর্বসম্মত রায় রয়েছে। তবে দ্বিতীয় অভিমত উত্তমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জবাব-২: এক চোখ অন্ধ ব্যক্তি যদি কিবলাহ নিজে চিনতে পারে এবং অন্যের সাহায্য ব্যতীত নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে তাহলে তার পিছনে নামাযের ইকতিদা করতে শরীআতে কোনো বাঁধা নেই। এমনকি তার পিছনে ইকতিদা মাকরূহের পর্যায়েও পড়ে না। (মাজমাউল আনহুর: ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা; রদ্দুল মুহতার: ১ম খণ্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

সাবিকুল ইসলাম ইবাদ
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

প্রশ্ন-৪: বিদায় হজ্জের সময় রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুইটি জিনিস রেখে গেলাম একটি কিতাবুল্লাহ আরেকটি আমার সুন্নাহ, তাহলে কেন মাযহাব মানব?

জবাব: কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে এতদুভয়ের বিধি-বিধান ও নির্দেশনার যথার্থ অনুসরণ বা বাস্তবায়ন। আর এ কথা কারো অজানা নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয় সর্ব-সাধারণের বোধগম্য নয়। তাই দুর্বোধ্য ও জটিল এবং বাহ্যত বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো না বুঝে অনুসরণ করা অসম্ভব। আর এ বিষয়গুলো যারা বুঝার যোগ্যতাসম্পন্ন তাদেরকে মুজতাহিদ বলা হয়। মুজতাহিদ নয় এমন লোকের জন্য নিজের পক্ষে যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করার সামর্থ না থাকায় কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের দুর্বোধ্য ও বিরোধপূর্ণ বিষয়াবলির সমাধানে যারা মুজতাহিদ এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রকৃত জ্ঞানী তাদের কারো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অনুসরণ করা আবশ্যক। কেননা সকল না জানা বিষয় সঠিক পন্থায় আয়ত্ত করার কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত একমাত্র পথ প্রকৃত জ্ঞানীগণের অনুসরণ। যাদেরকে পবিত্র কুরআন মাজীদে 'আহলুয যিকর' বা 'উলুল আমর' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে। তাই 'আহলুয যিকর' কিংবা 'উলুল আমর' কে মেনে চলতে হবে কেন? এ প্রশ্নের জবাব যা হবে মাযহাব মানব কেন -এর জবাবও তা ই হবে।

মাযহাবের তাকলীদ বা কোনো মুজতাহিদের রায় মেনে চলা কোনো নতুন বিষয় নয়। সাহাবায়ে কিরাম পবিত্র কুরআনের বহু অস্পষ্ট বিধানের আমল করার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যাকে অধিক জ্ঞানী (ফকীহ) মনে করতেন, তার ব্যাখ্যা ও রায় অনুয়ায়ী আমল করতেন। কোনো মুজতাহিদের অভিমতকে সঠিক মনে করে মান্য করার নামই মাযহাব অনুসরণ।

উল্লেখ্য যে, তথাকথিত লা-মাযহাবী গায়র মুকাল্লিদরা কোনো হাদীসকে সহীহ প্রমাণ করতে কোনো না কোনো হাদীসের ইমামের অভিমত অনুসরণ করে থাকে। এটা কি ব্যক্তির অনুসরণ নয়?

যাই হোক, ইসলামের বিধান পালনে সর্বক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ মাযহাব অনুসরণ। কুরআন ও সুন্নাহের যথার্থ মর্ম উদঘাটনপূর্বক শরীয়তের বিধি-বিধান নিরূপণে যে চারজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণের বিষয়ে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে তাদের ইজতিহাদপ্রসূত অভিমত ও ইজতিহাদের নীতিমান অনুসরণকে প্রচলিত অর্থে মাযহাবের তাকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়ে থাকে, যা প্রকৃত অর্থে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ। তাইতো বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস বিশারদ মনীষীগণের প্রায় সকলেই শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো না কোনো ইমামের তাকলীদ করেছেন।

নাজমুল ইসলাম
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন-৫: জনৈক শাইখ বলেছেন ওলীর (অভিভাবক) অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না, রেফারেন্স স্বরূপ তিনি হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে ওলীর অনুমতি ব্যতিত বিবাহ বাতিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: হযরত আয়িশা (রা.) ও হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, **لا نكاح إلا بولي** -অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ হবে না।

আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত হাদীস সুনানু আবি দাউদ, তিরমিযীসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে রয়েছে। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে, **أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل** –যে মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। এ দুটি হাদীসের হুকুম নাবালিগা মেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রকাশ থাকে যে, ওলায়াত দুই প্রকার- ১. ওলায়াতে নুদব ২. ওলায়াতে ইজবার।

ওলী কর্তৃক নাবালিগা, জ্ঞানশূন্য বোকা ও ক্রীতদাসীকে বিবাহ দেওয়ার যে অধিকার বা কর্তৃত্ব আছে তাকে 'ওলায়াতে ইজবার' বলে। ইজবার শব্দের অর্থ জবরদস্তি করা বা বল প্রয়োগ করা। আর যেহেতু ওলীর জন্য উল্লিখিতদের জবরদস্তিমূলকভাবে বিবাহ দেওয়ার অধিকার আছে। তাই এ ওলায়াতকে 'ওলায়াতে ইজবার' বলে। (শামী ২য় খণ্ড)

ওলীর জন্য বালিগাকে (চাই সে কুমারী হোক বা বিবাহিত হোক) বিবাহ দেওয়ার যে অধিকার বা ওলায়েত আছে, তাকে 'ওলায়াতে নুদব' বলে। নুদব অর্থ হলো মুস্তাহাব। আর বালিগাকে জবরদস্তিমূলকভাবে বিবাহ দেওয়ার অধিকার ওলীর নেই। এ সত্ত্বেও বালিগার ব্যাপারটি ওলীর উপর ন্যস্ত করা যাতে তাকে বেশরম, বেহায়া বলতে না পারে। এ ওলায়াতকে ওলায়াতে নুদব বলে। (শামী ২য় খণ্ড)

ওলায়াতে ইজবার অবস্থায় বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য ওলীর অনুমতি শর্ত। ওলীর অনুমতি ব্যতিত বিবাহ সহীহ হবে না। ওলী নাবালিগ ও নাবালিগাকে তাদের সম্মতি ছাড়াই বিবাহ দিতে পারে।

ওলায়েতে নুদব অবস্থায় বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য ওলীর অনুমতি শর্ত নয়। এ অবস্থায় পাত্রপাত্রীর অসম্মতিতে তাদের বিবাহ দেওয়ার অধিকার ওলীর নেই। বালিগ ও বালিগা ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে তা সহীহ হয়ে যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও ওলীর সম্মতি নেওয়া উত্তম। (শামী ২য় খণ্ড)

কেউ কেউ পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত "বিবাহ হবে না" দ্বারা বালিগার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ না হওয়া কিংবা উত্তম না হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা শুদ্ধ না হওয়াকে আবশ্যক করে না। হযরত আয়িশা (রা.) উক্ত হাদীসের মূল বর্ণনাকারী, তিনি তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর (রা.) এর মেয়েকে ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিয়েছেন। অধিকন্তু হযরত আয়িশা (রা.) নিজে এ মাসআলায় বিপরীত রায় দিয়েছেন। তাছাড়া হযরত আয়িশা (রা.) থেকে কোনো কোনো বর্ণনায় "ওলীর" পরিবর্তে "মাওলা" ব্যবহৃত হয়েছে, যা মূলত ক্রীতদাসীর বিবাহের ক্ষেত্রে তার মনিবের অনুমতি আবশ্যক হওয়া বুঝিয়েছে।

ওলীর (অভিভাবকের) অনুমতি ব্যতীত বালিগা নারীর বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, বালিগা বিবাহিতা নারী তার নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে অধিকতর অধিকার রাখে। আর বালিগা কুমারীকে তার বিবাহের বিষয়ে অনুমতি নেওয়া হবে এবং তার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা। (সহীহ মুসলিম; হাদীস নং: ১৪২১, সুনানু আবী দাউদ; হাদীস নং: ২০৯৮, সুনানু তিরমিযী; হাদীস নং: ১১০৮)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ও মুসান্নাফে আবদির রায্যাক এ হযরত আবূ সালামাহ ইবনে আবদির রহমান থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, এক নারীকে তার পিতা তার মতামত উপেক্ষা করে বিবাহ দিতে চাইলে উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করে এর প্রতিকার চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতাকে জিজ্ঞেস করে ঘটনার সত্যতা জানতে পেরে তাকে তার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করতে বললেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস নং ১৫৯৫৩, মুসান্নাফে আবদির রায্যাক, হাদীস নং ১০৩০৪)

আর পবিত্র কুরআন মাজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতে বিবাহকে সরাসরি নারীর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যা বিবাহ বৈধ কিংবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য অভিভাবকের অনুমতির আবশ্যকতা বুঝায় না। যেমন- সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতে এসেছে-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ-

"অতঃপর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার জন্যে হালাল (বৈধ) নয়।"

সুয়েব আহমদ
সোবহানীঘাট, সিলেট

প্রশ্ন-৬: মহিলাদের কণ্ঠে টিভি বা রেকর্ড প্লেয়ারে কুরআন তিলাওয়াত, হামদ, নাত শোনা জায়িয কি না?

জবাব: মহিলাদের কণ্ঠ গায়র মাহরাম পুরুষদের জন্য ফেৎনায় নিপতিত হওয়ার কারণ হওয়াতে তাদের কণ্ঠের তিলাওয়াত, হামদ, নাত ইত্যাদি শুনা নাজায়িয। পবিত্র কুরআন মজীদে নারীদেরকে গায়র মাহরাম পুরুষের সাথে একান্ত প্রয়োজনে কথা বলার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে যেন তারা মধুর আওয়াজে কথা না বলে, রুক্ষ বা কর্কষ আওয়াজে কথা বলে, যাতে পুরুষরা ফেৎনাগ্রস্ত না হয়।

পবিত্র কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে এসেছে-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

-হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। কারণ, এতে যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।" (সূরা আহযাব, আয়াত-৩২)

নামাযে ইমামের ভুল হলে মহিলাদের লুকমা দেওয়ার পদ্ধতি হিসেবে মুখে 'সুবহানাল্লাহ' বলার পরিবর্তে হাত দ্বারা তালি বাজানোর কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- **ولأن في صوتهن فتنة فكره لهن التسبيح**

-যেহেতু তাদের কণ্ঠস্বরে ফেৎনার আশংকা বিদ্যমান তাই তাসবীহ বলাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দনীয় মনে করেছেন। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯)

অনুরূপ মহিলাদের জন্যে নামাযে কিরাত নিঃশব্দে পড়ার বিধান করা হয়েছে। একই কারণে মহিলাদের জন্যে নামাযের আযান, ইকামত দেওয়ার বৈধতা নেই।

আব্দুল হাই মাসুম
মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা

প্রশ্ন-১: প্রচলিত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা যাবে কি না?

প্রশ্ন-২: টেলিভিশনে বেপর্দা নারী উপস্থাপিকার সংবাদ প্রচার শুনা যাবে কি?

জবাব-১: প্রচলিত ব্যাংক থেকে কোনো সুদী ঋণ গ্রহণ সর্বদা নাজায়িয চাই তা ব্যবসার জন্য হোক কিংবা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে হোক। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ গ্রহণ ও সুদ প্রদান উভয়ই হারাম। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه

-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং এর লিখক ব্যক্তিকে অভিশম্পাত করেছেন। (সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৩৩৩, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৬)

জবাব-২: পুরুষের জন্য টেলিভিশনে বেপর্দা নারী উপস্থাপিকার সংবাদ শুনা জায়িয নয়। কেননা তার চেহারা দেখার মধ্যে যেমন পর্দার সরাসরি লঙ্ঘন হয়ে থাকে, তদ্রুপ আওয়াজ শুনার মধ্যে ফেৎনার নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। বেগানা নারীর দিকে তাকানোকে কিংবা চোখের কুদৃষ্টিকে হাদীস শরীফে চোখের যিনা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এ মর্মে এসেছে-

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كل بني آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والنفس تمنى، وتحدث، ويصدق ذلك ويكذبه الفرج

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৮৫৯৮, মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৮৯৪৩)

মারজান আহমদ
ছাতক, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন-৯: তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কখন উঠানো উত্তম এবং কতটুকু পর্যন্ত হাত উঠাবেন কান বরাবর নাকি কাঁধ বরাবর?

জবাব: তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণের অধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে তাকবীর বলার পূর্বে হাত উঠিয়ে নেওয়া, তাকবীর বলা শুরু করতে হাত বাঁধার জন্য নামাতে শুরু করা এবং তাকবীর শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাত বেঁধে ফেলা। পুরুষ ও ক্রীতদাসীদের জন্য হাত কান বরাবর উঠানো এবং স্বাধীন নারীদের জন্য হাত কাঁধ বরাবর উঠানো সুন্নাত। এটিই হানাফী ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত। (আল মাবসূত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১, আল মুহিতুল বুরহানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০, মারাকিল ফালাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৬)

কামাল উদ্দীন
ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ

প্রশ্ন-১০: নাক ও মুখ ঢেকে নামায পড়া কি জায়িয? মাস্ক পরিধান করে নামায পড়ার হুকুম কি?

জবাব: বিনা প্রয়োজনে নাক ও মুখ ঢেকে নামায পড়া মাকরূহ। প্রয়োজনে হলে মাকরূহ নয়। হাদীস শরীফে নাক মুখ ঢেকে নামায পড়ার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা অগ্নিপূজারীদের উপাসনার সাথে সাদৃশ্যতার কারণে করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশংকার কারণে যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে মাস্ক পরিধান করে নামায আদায় মাকরূহ হবে না। কেননা জীবন রক্ষার প্রয়োজনে এটি গ্রহণযোগ্য ওজর। (আল মাবসূত, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩১, আল বাদাইয়ুস সানাঈ, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২১৬)

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন-১১: একজন মুসলমানের জন্য তাকওয়া অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন হলো, একজন মুসলমান কিভাবে তাকওয়া অর্জন করবে?

জবাব: একজন মুমিনের ঈমান পরিপূর্ণ করা, জীবন সফল করা, এমনকি আল্লাহর নৈকট্যের উচ্চ স্তরে নিজেকে পৌঁছানোর জন্যে তাকওয়ার বিকল্প নেই। যে এই গুণে যত বেশি গুণান্বিত সে-ই আল্লাহর নিকট ততবেশি সম্মানিত। তাই তাকওয়া অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাকওয়া অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের সার সংক্ষেপ থেকে কতিপয় বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ। পবিত্র কুরআনে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশের সাথে এসেছে: وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

-আর সত্যবাদীদের সাহচর্য গ্রহণ কর।

২. ওসীলা বা মাধ্যম অন্বেষণ। পবিত্র কুরআনে এসেছে- وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

-এবং তার নৈকট্য লাভের ওসীলা (মাধ্যম) তালাশ কর।

এ আয়াতে বর্ণিত মাধ্যম সম্পর্কে তাফসীরকারকগণের যে প্রধান দুটি উক্তি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে- ১. নেক আমল ও ২. তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত লোকের সাহচর্য গ্রহণ। যদিও উভয়টি তাকওয়া অর্জনের সহায়ক পন্থা, তবে তুলনামূলক প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি অধিক ফলপ্রসূ ও সহজতর ব্যবস্থা। এরই ভাবার্থ সূরা ফাতিহায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

-চালাও তাদের পথে যারা তোমার নিআমতপ্রাপ্ত।

অন্যত্র নিআমতপ্রাপ্তদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

-তারা (নিআমতপ্রাপ্তরা) হচ্ছেন- নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ।

তাই তাকওয়া অর্জনে সুহবত বা সান্নিধ্যের গভীর প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের কর্ম, চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে। দ্বীনের অনুসরণের সফলতা এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুহবত অবলম্বন করেছিলেন। সাহাবীদের সুহবত তাবিঈগণ এবং তাবিঈগণের সুহবত তাবে তাবিঈগণ অবলম্বন করেছিলেন, যাদের যুগকে তাদের উত্তমতার কারণে সর্বোত্তম যুগের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

৩. আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভয় করা।

৪. আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে জাগ্রত করা।

৫. সর্বদা মৃত্যু, কবর জীবন তথা পরকালের কথা স্মরণের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৬. আল্লাহর নিকট এর জন্য প্রার্থনা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়শ: এ দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

-হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করুন, একে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করুন, আপনি সর্বোত্তম পবিত্রতা দানকারী, আপনি এর মালিক ও নিয়ন্ত্রক।

৭. হারাম বা সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জন করা এমনকি সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।

৮. অনর্থক কথা, কাজ এবং চিন্তা-ফিকির থেকে বেঁচে থাকা।

৯. আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান প্রদর্শন করা।

১০. অন্তরে আল্লাহর মুহব্বত বৃদ্ধি করা ও পার্থিব বিষয়াদির মহব্বত কমানো।

১১. আল্লাহর ও তাঁর রাসূল ﷺ এর পূর্ণ আনুগত্য করা।

১২. আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি দান-খয়রাত করা।

এ সকল বিষয়াবলি তাকওয়া অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

আব্দুল হাই মাসুম
মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা

প্রশ্ন: 'শায়খ ইবনু আরাবী' কে ছিলেন? তার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার 'ওয়াহদাতুল উজুদ' এর তত্ত্ব যে তত্ত্বের কারণে কেউ কেউ তার উপর কুফরীর ফতওয়া দিয়েছেন, এ সম্পর্কে জানতে চাই।

জবাব: 'ইবনে আরাবী' যিনি মহিউদ্দিন ইবনু আরাবী নামে অধিক খ্যাত, প্রখ্যাত আরব সূফী-সাধক, সুউচ্চ তাত্ত্বিক, জ্ঞানী, সুপ্রসিদ্ধ

লেখক ও দার্শনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ২৮ জুলাই, ১১৬৫ সালে স্পেনের মুর্সিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাকে আন্দালুসী ও আল-মুর্সী বলা হয়ে থাকে। তিনি ১০ নভেম্বর ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সূফী হিসেবে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সূফীতত্ত্বে তার অনবদ্য অবদানের কারণে তিনি 'আশ শায়খুল আকবর' উপাধিতে ভূষিত হন। তার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ' তাসাওউফের পূর্ণাঙ্গ রীতি-নীতি সম্বলিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

'ওয়াহদাতুল উজুদ' হচ্ছে মহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর দুর্বোধ্য তাত্ত্বিক এমন এক মাসআলা, যা অনেকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে কিংবা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে এটি সর্বসাধারণের জন্যে বিপজ্জনক মনে করে এর বিরোধিতা করেছেন। আবার অনেকে সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তার যথার্থতা খুঁজে পেয়ে সমর্থন ও প্রশংসা করেছেন। 'ওয়াহদাতুল উজুদ' এর সঠিক অর্থ হলো "এই জগতের আসল এবং পরিপূর্ণ অস্তিত্ব কেবল এক আল্লাহর। তাঁর মহিমার কাছে অন্য সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব এমনভাবে বিলীন হয়েছে যে, যেন সেগুলো থেকেও নেই। যেমন দিনে সূর্যের আলোকে নক্ষত্র দেখা যায় না।

শাব্দিক বিচারে কেউ কেউ তাকে এ থেকে 'হুলুল' তথা আল্লাহর তাআলা আকারবিশিষ্ট হয়ে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হওয়ার এবং 'ইত্তিহাদ' তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টি একীভূত হওয়ার প্রবক্তা বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এ মহান বুযুর্গ এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রবক্তা না হওয়ার বিষয়ই তার পরবর্তী লেখা থেকে পরিষ্কার হয়েছে বলে বহু গবেষক তাদের গবেষণায় তুলে ধরেছেন এবং উক্ত বিষয়ের যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। এককথায়, ইলমে শরীআত ও মা'রিফাতে অভিজ্ঞ মাশায়িখদের ধারণা হলো তিনি এসবের প্রবক্তা নন। বরং তিনি আল্লাহর মহীমায় নিজেকে এমনভাবে ফানা (বিলীন) করতে সমর্থ হয়েছিলেন যেখানে অন্য কোনো অস্তিত্ব দেখার কোনো সুযোগ তার ছিল না। তাই একক যে অস্তিত্বের কথা তার উক্ত তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন সেটা দ্বারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বকেই বুঝানো হয়েছে। সর্বোপরি বিষয়টি জটিল, যা বড় বড় মনীষীগণ পর্যন্ত বুঝতে হিমশিম খেয়েছেন। তাই এ বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)সহ শরীআত ও মারিফাতের মান্যবর বহু মনীষী তাকে সমর্থন করে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার প্রায় ১৫০খানা ধর্মীয় তাত্ত্বিক গ্রন্থ পরবর্তী যুগের মনীষীগণের দুর্লভ জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে, যা তাকে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। অনেকের মতে, এ সংখ্যা মূলত তার রচিত গ্রন্থাবলির অর্ধেক। তার রচিত অনেক গ্রন্থাদি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। (তাবাকাতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৯; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড; আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ; তালিমুদ্দীন)

হাফিজ নজরুল ইসলাম
কুইন্স, নিউইয়র্ক

প্রশ্ন-১: লাশ দাফনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নারীরা কবরস্থানে পুরুষদের সাথে যেতে পারবে কি? নারীদের কবর যিয়ারতের বিধান কি? দলীলসহ জানতে চাই।

প্রশ্ন-২: জায়গার অসুবিধায় মৃতের লাশ মসজিদের ভিতর রেখে জানাযা পড়া যাবে কি?

জবাব-১: স্বভাবত লাশ দাফনে গায়র মাহরাম (অনেক) পুরুষ লোকের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। তাই এতে একই সময়ে নারীদের অংশ গ্রহণে পর্দার লঙ্ঘন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেজন্যে নারীদের জন্যে দাফনে অংশ গ্রহণে পুরুষদের সাথে কবরস্থানে যাওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে নাজায়িয।

মহিলাদের কবর যিয়ারত বিষয়ে ফকীহগণের অধিক নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ মত হলো- যিয়ারত করা জায়িয। তবে সর্বক্ষেত্রে পর্দা রক্ষা করা জরুরি।

আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ গ্রন্থে এসেছে,

وظاهر قول محمد رحمه الله تعالى يقتضي الجواز للنساء أيضا لأنه لم يخص الرجال وفي الأشربة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في زيارة القبور للنساء قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه لا بأس بها وفي التهذيب يستحب زيارة القبور.

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০)

জবাব-২: লাশ মসজিদের ভেতরে রাখা হোক বা বাইরে রাখা হোক বিনা ওজরে মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের ভেতর জানাযার নামায আদায় করবে তার কোনো সাওয়াব হবে না। (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৮৪)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় আছে, উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত সালিহ (র.) বলেন, জানাযার মাঠে জায়গা না হলে সাহাবীরা ফিরে যেতেন। নামাযে শরীক হতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১২০৯৭)

হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম ﷺ মসজিদেও দুজন সাহাবীর জানাযার নামায আদায় করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭৩)

এই দুই ধরনের হাদীসের মাঝে ফকীহগণ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জানাযার নামায মসজিদের বাইরেই আদায় করবে। আর কোনো ওজর থাকলে যেমন বৃষ্টি হলে কিংবা বাইরে পড়ার মতো ব্যবস্থা না থাকলে মসজিদের ভেতরও আদায় করা যাবে।

আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ গ্রন্থে এসেছে,

وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هو المختار، كذا في الخلاصة. ولا تكره بعذر المطر ونحوه، هكذا في الكافي.

জায়গার অসুবিধায় লাশ মসজিদের ভিতরে রেখেও জানাযার নামায মাকরূহ ব্যতীত জায়িয। কেননা এটি গ্রহণযোগ্য ওজর হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে অধিক সতর্কতা হিসেবে মসজিদে লাশের কফিন প্রবেশ করানোর আগে খাটিয়ার নিচে বা লাশের নিচে কোনো অতিরিক্ত পলিথিন জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে কদাচিৎ লাশ থেকে কোনো নাপাকি বস্তু বের হলে মসজিদ অপবিত্র না হয়। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫; রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৪)

অভ্যন্তরীণ

শূন্য পদে নিয়োগ পাচ্ছেন ৫৬ হাজার শিক্ষক

অবশেষে ৫৬ হাজার শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দিতে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। শিগগিরই ৫৬ হাজার শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে জানা গেছে। ফলে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর এই নিয়োগ জটিলতার নিরসন হলো। এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মূল বাধা মামলার বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত আমরা পেয়েছি। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এটি পাঠানো হবে। মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, প্রায় দুই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম। এ নিয়ে আন্দোলন করছেন নিয়োগপ্রত্যাশীরা।

এদিকে, বেসরকারি শিক্ষক পদে নিয়োগের সুযোগ পেতে হাইকোর্টে একটি রিট মামলা করেন ১৩তম নিবন্ধনধারীরা। রিটের ২ হাজার প্রার্থীকে আবেদনের সুযোগ দিতে নির্দেশনা দেন উচ্চ আদালত। এছাড়া যাদের বয়স ৩৫ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে তাদের সুযোগের বিষয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত হবে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত দিবস ১২ই রবিউল আউয়ালকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছে সরকার। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছে, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর দিবসটিতে বাংলাদেশের সব সরকারি ও বেসরকারি ভবন ও অফিস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এছাড়া বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও দূতাবাসগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। অবিলম্বে এ নির্দেশনা কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেলে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করা হবে এসব ভর্তি পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভায় এসব তারিখ ঠিক করা হয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা হবে ২১, ২২, ২৭ ও ২৮ মে এবং ৫ জুন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পরীক্ষা হবে ১০ জুন। প্রথমবারের মতো গুচ্ছ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠেয় তিনটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট, চুয়েট ও কুয়েট) পরীক্ষা হবে ১২ জুন। গুচ্ছ পদ্ধতিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা হবে ২৯ মে। আর প্রথমবারের মতো ২০টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা হবে তিন দিনে। এর মধ্যে মানবিক বিভাগের জন্য ১৯ জুন, বাণিজ্যের ২৬ জুন এবং বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষা হবে ৩ অথবা ১০ জুলাই। এ ছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হবে ৬ থেকে ১৮ জুন এবং ২০ জুন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ৪ থেকে ৫ জুন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ জুন, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ জুন এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের ভর্তি পরীক্ষা হবে ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২২ জুন থেকে ৮ জুলাই তারিখের মধ্যে তিন ধাপে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও সারা দেশে মেডিকেলের এমবিবিএসের ভর্তি পরীক্ষা হবে ২ এপ্রিল এবং ডেন্টালের পরীক্ষা হবে ৩০ এপ্রিল।

করোনা আপডেট

বিশ্বে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা সাড়ে ১১ কোটি। মৃত মানুষের সংখ্যা ২৫ লাখেরও বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার করোনা ডাটাবেস ওয়াল্ডোমিটারের গত ২৭ ফেব্রুয়ারির তথ্যমতে, এখন পর্যন্ত করোনা সেরে ওঠা মানুষের সংখ্যা ৮ কোটি ৯৬ লাখ ৩৩ হাজার। সরকারি হিসাবমতে বাংলাদেশে মোট মারা গেছেন, ৮ হাজার ৪০০ জন। বাংলাদেশে টিকাদান শুরু হয় ৭ ফেব্রুয়ারি। দুই ডোজে সম্পন্ন হবে করোনার টিকা। দুই সপ্তাহ পর দিতে হবে পরবর্তী ডোজ। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হবে আগামী ৭ এপ্রিল থেকে। বিদেশ যেতে হলে ডাবল ডোজের টিকা এবং করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে ২৯ লাখ মানুষ টিকা নিয়েছেন। নিবন্ধন করেছেন ৪০ লাখেরও বেশি। টিকা গ্রহণকারীদের মধ্যে মৃত্যু বা গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। দেশের সকল উপজেলায় টিকাদান করা হচ্ছে। টিকা গ্রহণের জন্য surokkha.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। পরিচয় যাচাই, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম তারিখ প্রদান করলেই নিবন্ধন সমাপ্ত হবে। পরবর্তীতে টিকা গ্রহণের জন্য এসএমএসে তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে।

চলতি বছর দেশে উদ্বোধন হবে ১৭০টি মডেল মসজিদ

সারা দেশের জেলা ও উপজেলায় নির্মিত হচ্ছে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র । ২০২১ সালের মধ্যেই ১৭০টি মসজিদ উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। জেলা পর্যায়ে ৪ তলা ও উপজেলার জন্য ৩ তলা এবং উপকূলীয় এলাকায় ৪ তলা মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। তিন ক্যাটাগরিতে নির্মিত হচ্ছে মসজিদগুলো। জেলা শহর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় ৬৯টি চারতলা মডেল মসজিদ থাকছে এ-ক্যাটাগরিতে। এগুলোর প্রতি ফ্লোরের আয়তন ২৩৬০ বর্গমিটার। ১৬৮০ বর্গমিটার আয়তনের বি-ক্যাটাগরির ৪৭৫টি মসজিদ হচ্ছে উপজেলায়। ২০৫২ বর্গমিটার আয়তনের সি-ক্যাটাগরির মসজিদ হবে ১৬টি উপকূলীয় এলাকায়। জেলা সদর ও সিটি করপোরেশন এলাকায় নির্মাণাধীন মসজিদগুলোতে একসঙ্গে ১২০০ মুসল্লী নামাজ আদায় করতে পারবেন। উপজেলা ও উপকূলীয় এলাকার মডেল মসজিদগুলোতে নামাজ আদায় করতে পারবে ৯০০ জন। রংপুর, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলায় দ্রুত তৈরি হচ্ছে এসব মডেল মসজিদ। সিরাজগঞ্জ ও রংপুর জেলায় ৯০ শতাংশ নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী এপ্রিলে ৫০টি, সেপ্টেম্বরে ৬০টি এবং ডিসেম্বরে ৬০টি মসজিদ উদ্বোধন করা হবে এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে সবগুলোর নির্মাণ সম্পন্ন হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনা প্রদান

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪ লাখ ৮৫ হাজার ৪৭৬ জন খামারিকে ৫৬৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা নগদ আর্থিক প্রণোদনা দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত খামারির সংখ্যা ৪ লাখ ৭ হাজার ৪০২ জন ও ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষির সংখ্যা ৭৮ হাজার ৭৪ জন। প্রদেয় টাকা খামারিদের বিকাশ, নগদ এবং ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের এ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক

উইঘুর ইস্যুতে চীনকে জাতিসংঘের হুশিয়ারি

উইঘুর মুসলিমদের অবস্থা দেখতে চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে প্রতিনিধি দল পাঠাতে চায় জাতিসংঘ। অ্যামেরিকা এবং কানাডার পরে এবার উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে চীনের উপর চাপ তৈরি করল জাতিসংঘ। ২৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বরেল বলেছেন, চীনের উচিত উইঘুর অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশে জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্তকারী দলকে ঢুকতে দেওয়া। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাশেলেটের নেতৃত্বে একটি দল শিনজিয়াং প্রদেশে পাঠাতে চাচ্ছে জাতিসংঘ। তবে এ বিষয়ে চীন এখনও কোনো মন্তব্য করেনি। এর আগের দিন সোমবার কানাডার পার্লামেন্টে চীন এবং উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে সেখানে বলা হয়েছে, চীন গণহত্যা চালাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতার শেষ পর্যায়ে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও প্রথম চীনের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনেছিলেন। সমস্যা হলো, এখন পর্যন্ত ওই অঞ্চলে কোনো সংগঠনকে যেতে দেয়নি চীন। সে কারণেই জাতিসংঘ চাপ সৃষ্টি করল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। - *রয়টার্স*

অভিশংসন থেকে ট্রাম্পের রেহাই

ক্যাপিটল হিলে কলঙ্কজনক হামলার ঘটনায় কংগ্রেসে অভিশংসিত হলেও সিনেটের বিচারে দ্বিতীয়বারের মতো রেহাই পেয়ে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করতে সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভোটাভুটিতে ৫৭ সিনেটর ট্রাম্প 'দোষী' বলে মত দেন। এর বিপক্ষে পড়ে ৪৩ ভোট। সাত রিপাবলিকান সিনেটরও দল থেকে নির্বাচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিপক্ষে ভোট দেন। কিন্তু তাদের অন্তত ১৭ রিপাবলিকানের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। সেটি পূরণ না হওয়ায় এই যাত্রায়ও টিকে গেলেন ট্রাম্প। ফলে আগামীতে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশ নিতে ট্রাম্পের আর কোনো বাধা রইল না। ক্যাপিটলে হামলায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে গত ১৩ জানুয়ারি ট্রাম্পকে অভিশংসিত করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি দুবার প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ২০১৯ সালে একবার প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হন ট্রাম্প। তবে সেবারও সিনেটে ভোটাভুটিতে তার পদ রক্ষা হয়।

মোদির সফরের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের প্রতিবাদ

কাশ্মীরে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ দেখিয়ে জার্মান সরকার দুটি অস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ভারতের কাছে ছোট অস্ত্র বিক্রির ছাড়পত্র দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জার্মানি আশঙ্কা করছে, এ সব ছোট অস্ত্র কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসেস (কেএমএস) এক রিপোর্টে জানিয়েছে, কাশ্মীরের পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক এটা দেখানোর জন্য নরেন্দ্র মোদির সফরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটানো ছাপা পোস্টারে উর্দুতে লেখা হয়েছে 'কাশ্মীর নরেন্দ্র মোদির সফরকে প্রত্যাখ্যান করছে। মোদির হাতে কাশ্মীরি জনগণের রক্ত। কাশ্মীরে বিজেপি'র হিন্দুত্ববাদ রোপণ করতে চাইছেন মোদি। জনসংখ্যার অনুপাত বদলে দিয়ে কাশ্মীরের মুসলিম ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বিলোপ ঘটাতে চান নরেন্দ্র মোদি।' এদিকে, ভারত অধিকৃত জম্মু কাশ্মীরে বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে, রাস্তায় ব্যারিকেড ও নিরাপত্তা চৌকি বসিয়ে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। একইসাথে শ্রীনগরের রাস্তায় টহল দিচ্ছে মিলিটারি কনভয়। - টেলিগ্রাফ

সাবালক হলেই মুসলিম মেয়েরা বিয়ে করতে পারবে

প্রাপ্তবয়স্ক হলেই ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবেন মুসলিম মেয়েরা। অর্থাৎ ১৮ বছরের নিচে মুসলিম কিশোরীরা সাবালক হলেই বিয়ে করতে পারবে। এই ঐতিহাসিক রায় দেয় ভারতের পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট। মুসলিম পার্সোনাল ল' মেনে এই রায় দিয়েছেন বিচারপতি অলকা সারিন। পাঞ্জাবের এক মুসলিম দম্পতির আবেদনের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এই রায়। পাঞ্জাবের বাসিন্দা ওই দম্পতি নিজেদের আবেদনে হাইকোর্টে জানিয়েছেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী তাদের বিয়ে হলেও তাতে সরকারি বৈধতা ছিল না। ৩৬ বছরের ওই ব্যক্তি ও তার ১৭ বছরের স্ত্রী নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা আদালতের মুখাপেক্ষী হলে আদালত জানিয়েছে, মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী তাদের স্বেচ্ছায় বিয়েতে বাধা নেই। - ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

তুর্কি সিরিজে প্রভাবিত হয়ে মার্কিন নারীর ইসলাম গ্রহণ

তুরস্কের টিভি সিরিজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ৬০ বছর বয়সী এক মার্কিন নারী। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের বাসিন্দা এই নারী নিজের নতুন নাম রেখেছেন খাদিজা। বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়, জনপ্রিয় টিভি সিরিজ 'পুনরুত্থান : আরতুগ্রুল' দেখে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন ওই নারী। ৬০ বছর বয়সী এই নওমুসলিম আরো বলেন, আমি সিরিজটি সম্পর্কে বিস্তারিত খতিয়ে দেখলাম। এরপরই তা দেখা শুরু করি। কয়েক পর্ব দেখার পরই ইসলামের প্রতি সত্যিই আগ্রহ জন্মে। সিরিজটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি এমন একটি ইতিহাস, যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। মূলত এটি ইসলামের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামের প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদও ইতোমধ্যে তিনি পড়ে শেষ করেছেন।

ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্রের তথ্য হামাসের কাছে

দখলদার ইসরায়েলের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচির তথ্য হামাস হাতিয়ে নিয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যক্রম বিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে, তারা ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সঙ্গে সম্পর্কিত এক ব্যক্তিকে আটক করেছে যিনি হামাসকে আয়রন ডোমের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন। আটক ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ আবু আদরু এবং তার বয়স ৪৩ বছর। তিনি দখলদার ইসরায়েলের দক্ষিণের রাহুফুত শহরের বাসিন্দা। একটি সূত্র বলছে, ইসরায়েল তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা আয়রন ডোমকে অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন বলে দাবি করলেও হামাসের রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। -*মিডল ইস্ট মনিটর*

ভারতে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা

ভারতের পাঁচ রাজ্যের ভোটের ইশতেহার ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু, আসাম ও পুদুচেরির ভোট ইশতেহার প্রকাশ করেন ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা। ইশতেহার অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট আট দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে। ২৭ মার্চ প্রথম দফায় শুরু হয়ে অষ্টম দফায় ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শেষ হবে। কেরেলায় ৬ দফায় ভোটগ্রহণ করা হবে। পাঁচ রাজ্যের ফল ঘোষণা করা হবে ২ মে। -টিওআই

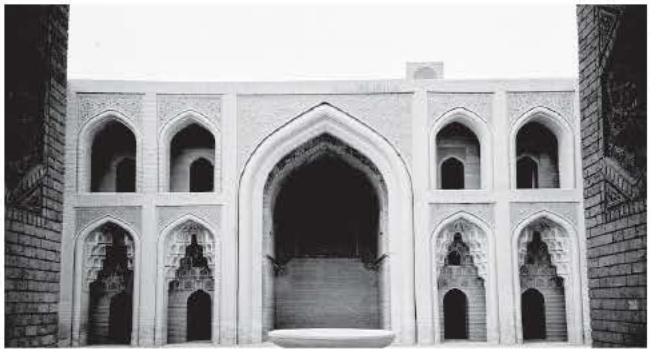

বাইতুল হিকমাহ

বাইতুল হিকমাহ গ্রন্থাগার, অনুবাদ ও শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র। আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদ ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ (১৬৭ হিজরি) এটি স্থাপনের আদেশ দেন। ইসলামের স্বর্ণযোগের বিজ্ঞান গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের মূলকেন্দ্র ছিল এ গ্রন্থাগারটি। খলিফা আবূ জাফর মনসুর গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তার নির্দেশে গ্রিক, চীনা, সংস্কৃত, সিরিয়াক প্রভৃতি ভাষা থেকে চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশল ও সাহিত্যের কয়েক হাজার গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়। তিনি এসব গ্রন্থের কপি রাজপ্রসাদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

খলীফা হারুনুর রশীদের পুত্র খলিফা মামুন এ কেন্দ্রটি আরও সম্প্রসারণ করেন এবং পৃথিবীর সকল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্য সেটি উন্মুক্ত করেন। তিনি রোম, পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের বহু দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ফলে গবেষণাগারটি সকল জ্ঞানীদের মনযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলমানগণ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

৯ম থেকে ১৩ শতক পর্যন্ত এ গবেষণাগারটিতে মুসলিমদের পাশাপাশি খ্রিষ্টান ও পার্সিরাও গবেষণার সমান সুযোগ পেতেন। সেসময় বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, চিকিৎসা ও সাহিত্যের কয়েক লাখ গ্রন্থ অনূদিত হয়। ১২৫৮ সালে কুখ্যাত মোঙ্গল শাসক হালাকু খান বাগদাদ দখল করার পর বায়তুল হিকমাহ ধ্বংস করেন এবং ৪০ লাখ পাণ্ডুলিপি দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেন। অবশ্য মোঙ্গল আগমনের খবর পেয়ে চিকিৎসক ও দার্শনিক নাসিরুদ্দীন তুসি চার লাখ বই সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। এসব পাণ্ডুলিপিই আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্যতম পথপ্রদর্শক বলে মনে করা হয়।

বাইতুল হিকমাহর গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার পর তা দজলা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। নাসিরুদ্দীন তুসি বলেন, পুড়ানো গ্রন্থের ছাইয়ে সেসময় ৩০ দিন দজলা ও ফোরাতের পানি কালো হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে হাজারো বছর পিছিয়ে যায় মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রসরতা

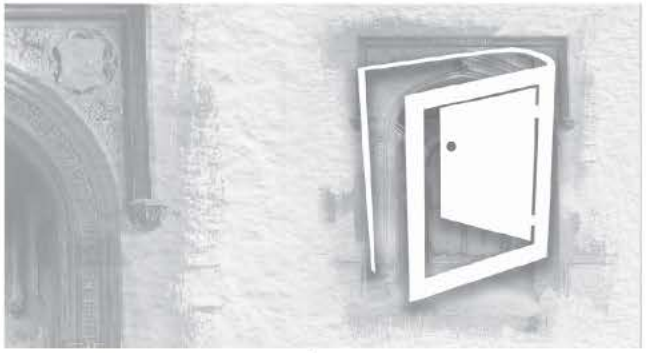

বানর

- হযরত দাউদ (আ.) এর সময় বনী ইসরাইলের লোকজন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ উপেক্ষা করে নিষিদ্ধ দিনে মাছ শিকারের শাস্তিস্বরূপ তাদের বানরে পরিণত করা হয়। সূরা বাকারার ৬৫-৬৬ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।
- বর্তমান বানরের প্রজাতিগুলো বনী ইসরাইলের বংশধর নয় বরং এগুলো স্বতন্ত্র। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আকৃতি পরিবর্তন করেন, তখন তাদের বংশ বিস্তার হয় না। বানর এবং শুকর তো পৃথিবীতে আগেই ছিল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৩)
- পৃথিবীতে বানরের ১৯টি প্রজাতি রয়েছে। এর ১৮টি প্রজাতিই এশিয়ায় বসবাস করে থাকে।
- পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বানরের প্রজাতি হলো 'পাইগিমিই মারমোসেট'। এদের ওজন মাত্র ১২০ গ্রাম এবং ১৪ সেন্টিমিটার লম্বা।
- ওয়াইল্ড লাইফের এক গবেষণা অনুযায়ী, বানর টিভি দেখতে খুবই পছন্দ করে। আনন্দের দৃশ্যে এরা খুশি হয় এবং কান্নার দৃশ্যে দুঃখিত হয়।
- প্রাণিজগতের ৯০ শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী সাতার জানলেও বানর সাতার কাটতে পারে না।
- বানরের গলায় পর্দা লাগানো থাকায় এরা কথা বলতে পারে না। সঙ্গীর সাথে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে এরা যোগাযোগ করে থাকে।
- দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যাওয়া 'হাওলার' নামক বানর যখন চিৎকার করে, ১০ মাইল দূর থেকে তা শোনা যায়।
- কলা বানরের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। শিকারী কলা দেখালে বানর কলার লোভে সহজে শিকারীর কাছে আসে।
- বানর প্রায়শই সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়।
- বানরের চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেন্ড থাকলে বানর প্রচণ্ড রেগে যায় এবং আক্রমণ করে।
- বানর পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। একশ্রেণির বানর গৃহকর্তার উকুন বেছে দিতে অত্যন্ত পারঙ্গম!

মঙ্গলে নামল রোভার পারসিভ্যারেন্স

পৃথিবীতে বসে দেখা গেল মঙ্গলের জেযেরো গহ্বরের ছবি। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' মঙ্গলগ্রহের সাম্প্রতিক ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করেছে। মঙ্গলগ্রহ থেকে পারসিভ্যারেন্স রোভারের পাঠানো উচ্চমানের তাক লাগানো ভিডিও ক্লিপটি ৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ডের। লাল ও সাদা রঙের প্যারাসুটের সাহায্যে নাসার রোভারটির মঙ্গলপৃষ্ঠে নামার দৃশ্য ধরা পড়েছে ওই ভিডিওতে। রোভারের ভেতরে লাগানো ক্যামেরার সাহায্যে ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ ঢেউ খেলানো। দেখা যাচ্ছে বড় বড় গহ্বর। মঙ্গলকে দেখতে মরুভূমির মতো মনে হচ্ছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ লালগ্রহের মাটিতে নামে নাসার পারসিভ্যারেন্স রোভার। বিষুবরেখার কিছুটা উত্তরে জেযেরো খাদের ধুলা-আচ্ছন্ন এলাকায় অবতরণ করে রোভারটি। ধারণা করা হয়, পয়তাল্লিশ কিলোমিটার চওড়া জেযেরোয় এক সময় ছিল একটি হ্রদ। সেই হ্রদে ছিল প্রচুর পানি এবং খুব সম্ভবত সেখানে প্রাণের অস্তিত্বও ছিল। স্লাভিক জেযেরো শব্দের অর্থ হলো হ্রদ। লালগ্রহে অবতরণের পর রোভার পারসিভ্যারেন্স মাইক্রোফোনে একটি অডিও ধারণ করতে সক্ষম হয়। ৬০ সেকেন্ডের ওই অডিওটিতে মঙ্গলে ঝাপটা বাতাসের শব্দ শোনা গেছে।

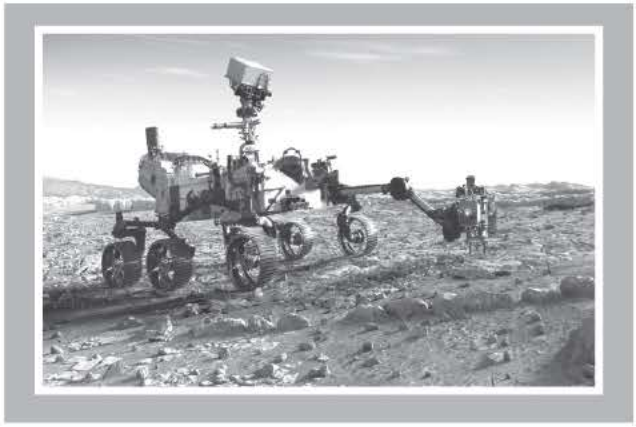

ছয় চাকার এই রোবটযান আগামী দুই বছর মঙ্গল গ্রহ থেকে নমুনা সংগ্রহের কাজ করবে। প্রাচীন হ্রদ এলাকার মাটিপাথরের মধ্যে খনন চালিয়ে এটি অতীত অণুজীবের অস্তিত্ব সন্ধানের কাজ করবে। পারসিভ্যারেন্স মঙ্গলগ্রহে কার্বনডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরির কাজ করবে। লালগ্রহে পানির খোঁজ চালাবে। মাটির নিচে জীবনের ইঙ্গিত নিয়েও গবেষণা চালাবে। সেইসঙ্গে লালগ্রহের আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়েও গবেষণা চালাবে পারসিভ্যারেন্স। আগামী দুই বছর চলবে এসব অনুসন্ধান ও গবেষণা।

গত বছরের ৩০ জুলাই পারসেভারেন্স রোভারটি লাল গ্রহে পাঠানো হয়। দীর্ঘ ছয় মাসের বেশি সময় ভ্রমণের পর রোভারটি সফলভাবে মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করতে সক্ষম হয়। পারসিভ্যারেন্স রোভারের ভিতরে রয়েছে আরেকটি মহাকাশযান। 'ইনজেনুইটি' নামের ওই যানটি গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের পর তৃতীয় পেরিয়ে আমরা পা ফেলছি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দরজায়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছে প্রযুক্তির সঙ্গে জৈব অস্তিত্বের সংমিশ্রণে এক নতুন সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যে রোবটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট, ন্যানো প্রযুক্তি যে অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তাতে এই বিপ্লবের ব্যাপ্তি ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন হয়ে পড়ছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে যে সব প্রযুক্তি আমাদের জীবন আমূল বদলে দিবে তার অন্যতম হলো, 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বাংলাদেশে যখন সোফিয়া রোবটের আগমন হয় তখন কমবেশি সবাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নাম শুনেছেন। আপনি কি জানেন? গুগল সার্চ করতে গিয়ে যখন আমরা বানান ভুল করি, তারপরও কিভাবে সঠিক ফলাফল প্রদর্শন করে গুগল? কাজটা হয় কিন্তু এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। এছাড়াও আপনি গুগলে কোনো কিছু সার্চ দেওয়ার পর যখন কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, ওই ওয়েবসাইটে ঠিক ওই রকম অ্যাডই শো করে যা আপনি সার্চ দিয়ে খুঁজেছিলেন। অর্থাৎ, সার্চ ইঞ্জিনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স আপনাকে মনিটর করছে, আপনার প্রয়োজন বুঝে নিচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে সার্ভিস দিচ্ছে।

আপনার মেইলের কথা ভাবুন। প্রতিদিনই আপনার ইনবক্সের স্প্যাম ফোল্ডারে প্রচুর মেইল জমা হচ্ছে, যা আপনার জন্য কোনো কাজের নয়, বরং ক্ষতিকর। মেইলিং সিস্টেম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ঠিকই বুঝতে পারে কোন মেইলটি আপনার জন্য দরকারি আর কোনটি নয়। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে চলছে প্রচুর গবেষণা। বিশ্বের বিখ্যাত সকল প্রযুক্তিবিদ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারে বলেছেন, এর প্রতিক্রিয়া হবে মানুষের উন্নতির সর্বোচ্চ পর্যায় অথবা মানুষের ধ্বংসের প্রধান কারণ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বাংলায় অনুবাদ করলে হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সাধারণভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে সক্ষম কম্পিউটার বা মেশিনকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলা হয়। বর্তমান সময়ের কম্পিউটার বা মেশিনে মানুষ যে কমান্ড বা নির্দেশ দেয়, সেই মোতাবেক কাজ করতে পারে। এর বাইরে নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে কম্পিউটার বা মেশিন নিজে নিজেই কাজ করতে পারে, চিন্তা করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন প্রায় সকল কাজে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার হচ্ছে। বক্ষমাণ আলোচনা দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের গুরুত্ব কতটা বেশি। বড় আকারের ডাটা সংরক্ষণ ও সুবিন্যস্তভাবে সাজানো এবং সেখান থেকে মানুষের সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য দেখানোর কাজটাও খুব সহজেই করা যাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে।

সংকলনে: মুমিনুল ইসলাম

বৃত্তান্ত

পৃথিবী গোলাকার। তা থেকে এসেছে বৃত্তের ধারণা। গণিতশাস্ত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হচ্ছে বৃত্ত। শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রয়েছে বৃত্তের ব্যবহার। এ আলোচনায় জেনে নিব বৃত্তের পরিচয়। একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমান দূরত্ব বজায় রেখে অপর একটি বিন্দু তার চারদিকে একবার ঘুরে এলে যে ক্ষেত্র তৈরি হয় তাকে বৃত্ত বলে। সহজ কথায়, কম্পাসের সাথে পেন্সিলযুক্ত করে কাগজের উপর কম্পাসের কাটা বসানো হলো। কম্পাসের কাটা স্থির রেখে পেন্সিলকে চারপাশে ঘুরিয়ে আনলেই বৃত্ত তৈরি হয়। এখানে কম্পাসের কাটা যে বিন্দুতে থাকবে তা বৃত্তের কেন্দ্র এবং পেন্সিলে অঙ্কিত গোলাকার বক্ররেখা হলো বৃত্তের পরিধি। পরিধির যেকোনো দুই বিন্দুর সংযোজক রেখাংশকে জ্যা বলে। একটি বৃত্তে অসংখ্য জ্যা আঁকা যায়। কিন্তু যদি এ জ্যা কেন্দ্র স্পর্শ করে যায় তবে এটার নাম হবে ব্যাস। কেন্দ্রগামী সকল জ্যা-ই ব্যাস [৩০তম বিসিএস]। কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে বলা হয় ব্যাসার্ধ [রাজস্ব কর্মকর্তা: ১৫]। সুতরাং ব্যাসার্ধ হলো ব্যাসের অর্ধেক।

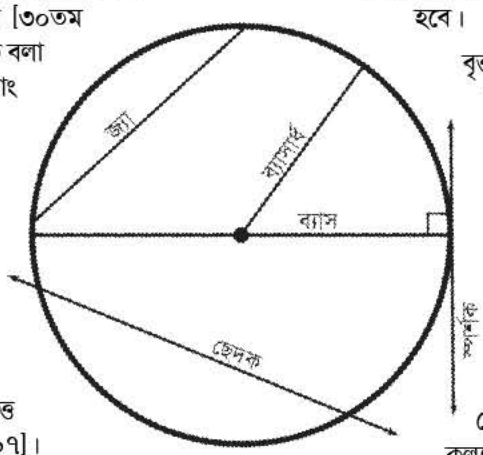

কম্পাস ধরলেই বৃত্ত আঁকা যায় সত্যি। কিন্তু কিছু অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। অনুসিদ্ধান্ত হলো এমন বাস্তব সংজ্ঞা যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। যেমন: (১) একই সরলরেখায় অবস্থিত নয় এমন তিনটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি ও কেবল একটি বৃত্ত আঁকা যাবে। (২) একই সরলরেখায় অবস্থিত এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে কোনো বৃত্ত আঁকা যাবে না [রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক অফিসার: ৯৭]। (৩) কোনো বক্ররেখায় অবস্থিত তিনটি বিন্দু দিয়ে মাত্র একটি বৃত্ত আঁকা যায়। (৪) একই সরলরেখায় অবস্থিত দুইটি বিন্দু দিয়ে অসংখ্য বৃত্ত আঁকা যায় [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক: ২০০৯]

জ্যা বিষয়ক অনুসিদ্ধান্ত: (১) বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা এর উপর অঙ্কিত লম্ব ঐ জ্যাকে সমদ্বিখন্ডিত করে। বিপরীতভাবে বলা যায়, বৃত্তের যেকোনো জ্যা এর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক কেন্দ্রগামী। (২) বৃত্তের সমান সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী [১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন]। বৃত্তের দুটি জ্যায়ের মধ্যে কেন্দ্রের নিকটতম জ্যাটি অপর জ্যা অপেক্ষা বৃহত্তর। (৩) বৃত্তের জ্যা দুটি পরস্পর সমদ্বিখণ্ডিত করলে তাদের ছেদ বিন্দু বৃত্তটির কেন্দ্র [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক : ০১]। (৪) বৃত্তের ব্যাসই হলো বৃহত্তম জ্যা। (৫) বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী সকল জ্যা পরস্পর সমান।

স্পর্শক: একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার যদি একটি ছেদবিন্দু থাকে তবে রেখাটিকে বৃত্তের স্পর্শক বলে। একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার যদি দুইটি ছেদবিন্দু থাকে তবে তাকে ছেদক বলা হয়। একই সরলরেখা যদি দুইটি বৃত্তের স্পর্শক হয়, তবে তাকে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শক বলা হয়।

স্পর্শক বিষয়ক অনুসিদ্ধান্ত: (১) একটি বৃত্ত ও একটি সরলরেখার সর্বাধিক দুটি ছেদবিন্দু থাকতে পারে। (২) বৃত্তের কোনো বিন্দুতে মাত্র একটি স্পর্শক আঁকা যায় [কারিগরি শিক্ষা ইনস্ট্রাক্টর: ১৮]। (৩) বৃত্তের যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব। (৪) বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তের মাত্র দুটি স্পর্শক টানা যায়, ঐ বিন্দু থেকে স্পর্শ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব সমান [বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা: ২০১০]। (৫) স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এবং স্পর্শকের অন্তর্ভুক্ত কোণ এক সমকোণ [প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক :১২] (৬) দুইটি বৃত্ত পরস্পর স্পর্শ করলে তাদের কেন্দ্রদ্বয় ও স্পর্শবিন্দু সমরেখ হবে। (৭) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধের সমষ্টির সমান হবে। (৮) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব বৃত্তদ্বয়ের ব্যাসার্ধের অন্তরে সমান হবে।

বৃত্তচাপ: পরিধির যেকোনো অংশকে বলা হয় বৃত্তচাপ। একটি জ্যা বৃত্তকে দুটি চাপে বিভক্ত করে [সহকারী প.প. কর্মকর্তা: ১৬] এক্ষেত্রে ছোট অংশকে উপচাপ এবং বড় অংশকে অধিচাপ বলা হয়।

বৃত্ত সংশ্লিষ্ট কোণ: (১) অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন]। (২) একই চাপের ওপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ বা পরিধিস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান। (৩) একই চাপের ওপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ বা পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ [প্রবাসী কল্যাণ ইন্সট্রাক্টর: ১৮]। এটিকে উল্টোভাবে বলতে পারি, একই চাপের ওপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ বা পরিধিস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক। (৪) কোনো বৃত্তে অধিচাপে অন্তর্লিখিত কোণ সূক্ষ্মকোণ এবং উপচাপে অন্তর্লিখিত কোণ স্থূলকোণ [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন]।

বৃত্তস্থ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সম্পর্কিত অনুসিদ্ধান্ত: (১) বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের যেকোনো দুইটি বিপরীত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। যেমন: বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী :১৬] (২) বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি আয়তক্ষেত্র [পরিসংখ্যান কর্মকর্তা: ১৭] (৩) বৃত্তের ভিতরে কোনো রম্বস আঁকা যাবে না [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন] সুতরাং সমান সমান বাহু বিশিষ্ট ক্ষেত্রটি হবে বর্গ। (৪) বৃত্তের স্পর্শক বাদে যেকোনো জ্যামিতিক চিত্র বৃত্তের সাথে ন্যূনতম দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে। যেমন: একটি ত্রিভুজ ও বৃত্ত ন্যূনতম দুইটি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে [এনএসআই সহকারী পরিচালক: ১৫]

বৃত্তকলা: বৃত্তের দুইটি ব্যাসার্ধ ও একটি চাপ দ্বারা গঠিত অঞ্চলকে বৃত্তকলা বলে।

সংকলন: মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

কবিতা

মিরাজ রজনী

মূল: আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)

কাব্যানুবাদ: কবি রুহুল আমীন খান

কী মহিমা আল্লাহ তাআলার মাটির জগৎ ছাড়ি
বনী আদম দূর নীলিমায় শূন্যে দিলেন পাড়ি।
সিদরাতুল মুনতাহা হলো সীমা ফিরিশতার
আরশে আলা শেষ সীমানা নবী মুস্তফার।
সকল নবীর মিরাজ হলো মাটির দুনিয়ায়
ইউনুস নবীর মাছের পেটে মিরাজ দরিয়ায়।
নবী যখন আকাশ পরে করেন পদার্পণ
জাগল তখন দিকে দিকে পুলক-শিহরণ।
জানান তাঁকে খোশ আমদিদ নবী রাসূল সব
মারহাবা মারহাবা ধ্বনি উঠল খুশির রব।
হুর গিলমান ফিরিশতাকুল সবাই মনের খোশে
মুবারক হো, মুবারক হো বলল মহাজোশে।
বলেন সকল নবী রাসূল ছিলাম রাহা চেয়ে
ধন্য হলাম সবাই মোরা আপনাকে আজ পেয়ে।
আহা! আহা! কী খোশনসীব আজকে আমাদের
দীদার পেলাম মেহমানের আর্শে আজীমের।
কুল মালায়েক ভাগ্য রবি উঠল মোদের ভালে
খোদার হাবীব এলেন হোথা আরশ সফরকালে।
হে কলন্দর মিরাজ তোমার পাক মদীনার মাটি
নবী পাকের ওই চেহারা খোদার নূরের ঘাঁটি।

শবে-বরাত

গোলাম মোস্তফা

সারা মুসলিম দুনিয়ায় আজি এসেছে নামিয়া 'শবে-বরাত'
রুজি-রোজগার-জান-সালামৎ বণ্টন-করা পুণ্য রাত।
এসো বাংলার মুসলিমিন
হৃত বঞ্চিত নিঃস্ব দ্বীন,
ভাগ্য-রজনী এসেছে মোদের, কর মোনাজাত-পাতো দু'হাত।
ভান্ডার-দ্বার খুলেছে আজিকে দয়াময় রহমান-রহিম,
বিশ্ব-দানের উৎসব আজি চিরপবিত্র মহামহিম।

শত ফেরেশতা দলে দলে
দিকে দিকে আজি ওই চলে,
নিখিল বিশ্বে একি কলরোল- একি প্রীতি-প্রেম-স্নেহ অসীম!
আকাশ-তোরণে রৌশন-চৌকি-উৎসব-নিশি আলো-জ্বালা,
ঝালর-ঝুলানো ঝাড়-লণ্ঠন পূর্ণিমা-চাঁদ সুধা-ঢালা।
...

হয়ে থাকি যদি অপরাধী
তাই বলে এত বাদাবাদি?
সবাই মোদের মেরে যাবে, আর তুমি দূর হতে চেয়ে রবে?
হবে না প্রভু হবে না তা- আজি এ মহাদানের শুভ রাতে
আমাদের পানে চাহিতে হইবে করুণ-কোমল আঁখি-পাতে।

করে যারা তব অসম্মান
তাহাদের দাও কত না দান।
আমাদের কি গো নাই অধিকার তব প্রেম-সুধা-করুণাতে?
বল, কথা দাও, সাড়া দাও আজি, জবাব দাও এ প্রার্থনার,
যদি নাহি দাও- খাবো না আমরা আজি এ ফিরনী-রুটি তোমার।

না জাগে আজিকে যদি এ জাত
মিথ্যা তোমার 'শবে-বরাত।'
মিথ্যা তোমার ভুবনে ভুবনে এত আয়োজন দান-করার।
শবে-বরাতের রাত্রিতে আজি, চাহি নাকো শুধু ধন ও মান,
সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশি- জাতির দিওগো মুক্তি দান।

জাগরণ লিখো নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,
নব-গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান।

জন্মবার্ষিকীতে
আবদুল মুকীত চৌধুরী

শাশ্বত কালের স্রোতে জন্মের ধারাবাহিকতা,
পিতা-মাতা-স্বজনের আপ্লুত আনন্দ-বার্তা।
দুআ-শুভেচ্ছায় সেই প্রত্যাশিত যাত্রা সূচনায়,
অতঃপর পরিক্রমা বর্ষ-যুগ কাল গণনায়।
আগমন-পর্ব, সে তো উচ্ছ্বাস-উল্লাসে প্রিয়জন–
না-হাঁটা শিশুর পথে শুভেচ্ছার পুষ্পবর্ষণ!

মানব সৃষ্টি-লগ্নে ইচ্ছা ঘোষে কালাম স্রষ্টার,
'প্রতিনিধি': আদি পিতা আদমের উত্তরাধিকার।
জিন-ইনসানের জন্য 'ইবাদত' কাম্য স্রষ্টার,
সিজদায় প্রণত হবে সর্বজন মানব-সংসার।
স্ব-কল্যাণ তো বটেই, এবং সে মানব কল্যাণ,
বিশ্বনবীর উম্মা'য় আলোকিত হবে এ জাহান।

অথচ–
বিভ্রান্তি-বিচ্যুতির আবর্তে নিমগ্ন জীবন,
সংশোধন সাফল্যের চিত্রে অতি ক্ষুদ্র আয়োজন।
পঙ্কিল-ক্লেদাক্ত ধাবমান আয়ুষ্কাল এই,
হিসাব নিকাশ চাই–মৃত্যু আসে ঐ অচিরেই।

পাথেয় নেই জানি; কিন্তু সত্য কালাম আল্লাহর:
আয়াত তেপ্পান্ন, ঊনচল্লিশ সূরা যুমার–
"বল, হে বান্দারা আমার,
তোমরা যারা নিজেদের প্রতি করেছো অবিচার,
নিরাশ হয়ো না হতে অনুগ্রহ আল্লাহর;
আল্লাহ ক্ষমা করবেন সমুদয় পাপ।
তিনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু পরম।"
সুতরাং দূর হবে মনস্তাপ।
মুক্তিতে নৈরাশ্য নয়–
কুরআন মজীদ চির প্রতিশ্রুতিময়,
নাজাতের ভরসাই জানি সর্বোত্তম।
...

[বিশিষ্ট কবি, গবেষক, সাংবাদিক আবদুল মুকীত চৌধুরী ২ মার্চ ৭৯তম বর্ষে পদার্পণ করছেন। আমরা তাঁর নেক দীর্ঘায়ু কামনা করি। –সম্পাদক]

সংগীত

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
মুজাহিদ বুলবুল

স্বাধীনতা দেখিনি কান পেতে তবু শুনি সে আর্তনাদ
সন্তান হারা মায়ের কণ্ঠে স্বাধীন ভূমির স্বাদ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

ছেলে হারানোর নির্মম স্মৃতি ভুলতে পারেনি মা
বুক ফেটে তাই ভাসছে বাতাসে অবিরত কান্না
যাঁদের বুকের শূন্যতা দেশ করে গেছে আযাদ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

হৃদয়ের মাঝে খুদাই করে লিখেছি তাদের নাম
যতদিন রবে চন্দ্র সূর্য রবে তারা অম্লান
যাঁদের জন্য স্বাধীন এ আকাশ স্বাধীন রূপালি চাঁদ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

দেহ
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিখুঁত এই দেহ মোর আল্লাহর মহাদান
দিয়েছেন তাতে এক সুন্দর প্রাণ।
কখনো ঘুমায় দেহ কখনো জাগে
কখনো সামান্য আঘাতে খুব বেশি রাগে।
দাঁড়িয়ে আছে দেহ দু'পায়ের উপর
এ যেন এক নড়বড়ে ঘর।
দু'পাশে হাত দু'খানা আছে তার ঝুলে
সারা জীবন থাকে সেথা যায় না খুলে।
আগুন, পানি. বাতাস এবং মৃত্তিকার
ঘটেছে দেহে জানি এসবের সমাহার।
পঞ্চইন্দ্রীয় দ্বারা করে সে অনুভব
ঠান্ডা-গরম, আগুন-পানি আরো যতসব।
কর্ণ, নাসিকা আর নয়ন যুগল
যথাস্থানে বসা আছে এদের সকল।
মস্তিষ্কে সংরক্ষণ ক্ষমতা আছে যত তার
হার মেনেছে তাতে আধুনিক কম্পিউটার।
এ সুন্দর দেহ মোর দানটা খোদার
শুকরিয়া জানাই তবে আমরা তাঁর।

অভিনব বিচার

মুহাম্মদ উসমান গণি

ছোট্ট বন্ধুরা! নবী রাসূলগণ আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ। কেবল নবুওয়াত প্রকাশের পরবর্তী সময় নয় বরং শৈশব থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত পুরো জীবন উম্মতদের জন্য অনুসরণীয়। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কাবাঘরের সম্মুখে হাজরে আসওয়াদ স্থাপনে মক্কাবাসীদেরকে ফায়সালা দিয়েছিলেন। এ কথা আমরা সকলে জানি। এ ধরনের দৃষ্টান্ত অন্য নবীদের বেলায়ও ছিল। আজ তোমাদেরকে একটি বুদ্ধিদীপ্ত বিচার ফায়সালার গল্প শুনাব। যে ফায়সালাটি দিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান (আ.)। সুলাইমান (আ.) তখন ছিলেন কিশোর। এ চমৎকার গল্পটি আমাদের প্রিয়নবী ﷺ সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, দুজন মহিলার সাথে তাদের দুটি ছেলে ছিল। একদা একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের মধ্যে একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার সঙ্গিনীকে বলল, বাঘ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। অপরজন বলল, তোমার ছেলেকেই বাঘ নিয়ে গেছে। সুতরাং তারা দাউদ (আ.) এর নিকট বিচারপ্রার্থী হল। তিনি বড় মহিলাটির ছেলে বলে ফায়সালা দিলেন। অতঃপর তারা দাউদ (আ.) এর পুত্র সুলাইমান (আ.) এর নিকট গিয়ে উভয়েই ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটি চাকু দাও। আমি একে দু টুকরো করে দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেব। তখন ছোট মহিলাটি বলল, আপনি এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। ছেলেটি ওরই। তখন তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার ফায়সালা দিলেন।

গল্প

এক অহংকারীর গল্প

ইবরাহীম বিন আতিক

হযরত বায়জিদ বুস্তামী (র.) আল্লাহর মহান একজন ওলী ছিলেন। ইরানের শীর্ষস্থানীয় সূফীদের অন্যতম। তাকে আল্লাহওয়ালাদের ইমাম বলা হয়। মাতৃভক্তির জন্য তার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। অসংখ্য মুরীদের মুরশিদ ছিলেন তিনি। তার সময়ে একজন অহংকারী লোক ছিল, যে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করেই রাত দিন কাটিয়ে দিত। কিন্তু এত ইবাদত করেও লোকটি ইবাদতের কোনো স্বাদ পায় না। আল্লাহর অন্যান্য বান্দাহগণ মালিক ও মাওলার গোলামীতে স্বাদ পেলেও লোকটি কোনো স্বাদ বুঝতে পারে না। এজন্য তার আফসোসও হয়।

একদিন সে ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হযরত বায়জিদ বুস্তামী (র.) এর দরবারে আসল। এসে বলল- হুযূর! আমার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, হৃদয়ের সজীবতা চলে গেছে। আমি অনেক ইবাদত, বন্দেগী করি, বিশ বছর যাবত শরীআতের অবাধ্য হইনি। কিন্তু আমি ইবাদতের কোনো মজা পাই না, আমার মনের মধ্যে এর কোনো স্বাদ জাগে না। ইবাদতের কোনো নূর আমার অন্তরে বুঝতে পারি না। কত নেককার আছেন যাদের কাছ থেকে শুনি তারা ইবাদতে দাঁড়ালে আল্লাহর বিশেষ দয়া ও রহমত তারা বুঝতে পারেন, তাদের অন্তর নূরানী হয়ে যায়। আমি এত ইবাদত করার পরও কেন এগুলো বুঝতে পারি না?

বায়জিদ বুস্তামী (র.) তার হাত ধরলেন এবং লোকটির রোগ শনাক্ত করার চেষ্টা করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন লোকটি খুব দাম্ভিক। অহংকার নামক রোগ তার অন্তরকে ঘিরে রেখেছে, এজন্য সে ইবাদতে কোনো স্বাদ পায় না। রোগের কথা উল্লেখ না করে বায়জিদ বুস্তামী তাকে বললেন, প্রিয় ভাই! তুমি বিশ নয় বরং যদি একশ বছরও আল্লাহর ইবাদত করো তারপরও তুমি ইবাদতের কোনো স্বাদ পাবে না। আল্লাহর ভালোবাসার নাগালও পাবে না।

এমন কঠিন কথা শুনে লোকটি চিন্তিত হয়ে এর কারণ জানতে চাইল। বায়জিদ বুস্তামী বললেন, অহংকার তোমাকে ঢেকে রেখেছে, দাম্ভিকতা তোমাকে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে।

লোকটি ভয়ে কম্পিত হয়ে জিজ্ঞেস করল- হুযূর, এই রোগের কি কোনো ঔষধ নেই? বায়জিদ বুস্তামী (র.) বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই আমার কাছে তোমার অহংকার রোগের প্রতিষেধক আছে।

বায়জিদ বুস্তামী তাকে বললেন, তুমি নাপিতের কাছে যাবে এবং মাথার চুল মুণ্ডন করবে। তারপর শরীরে যে জামা আছে সে জামাটি খুলে ফেলবে। এই অবস্থায় বাজারে গিয়ে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ খাবার এবং পানীয় কিনবে। এগুলো তোমার কাঁধে এবং মাথায় বহন করে নিজের এলাকায় যাবে, যাদের খাবারের প্রয়োজন তাদেরকে নিজ হাতে বিতরণ করবে। তারা খাবার শেষ করে নিলে তাদেরকে পানি পান করাবে, তুমি নিজে তাদের হাত পরিষ্কার করে দিবে। যদি তারা তোমাকে বলে তাদেরকে উযূ করিয়ে দিতে তাহলে তুমি তাদের কথা পালন করবে। এই কাজগুলো করো, তোমার অন্তর থেকে অহংকার দূর হয়ে যাবে।

লোকটি বলল, হুযূর! আমি এগুলো করতে পারব না। গরীব মিসকীনদের দরজায় গিয়ে খাবার আর পানীয় সরবরাহ করা আমার জন্য কঠিন। এই কাজ ছাড়া কি অন্য কোনো প্রতিষেধক নেই? বায়জিদ বুস্তামী বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার পক্ষে এই কাজগুলো করা কঠিন। কারণ অহংকার তোমার অন্তরকে দূষিত করে রেখেছে। তুমি যদি তোমার দাম্ভিকতা দূর করে এ সকল মানুষদের কাছে যেতে তাহলে তাদের দুআ লাভ করতে পারতে। এর মাধ্যমে তুমি বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে।

বায়জিদ বুস্তামী (র.) এর কথা শুনে লোকটি তার শহর থেকে অনেক দূরে চলে গেল। শহর থেকে দূরে যাওয়ার কারণ হলো অপরিচিত এলাকায় এসব কাজ করলে কেউ তাকে চিনবে না। শহরের বাহিরে লোকটি বায়জিদ বুস্তামীর কথামতো কাজ করল। অনেক দিন এসব কাজ করলেও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই সে বায়জিদ বুস্তামীর কাছে ফিরে আসল। তিনি সব কিছু অবগত হয়ে বললেন, তুমি যদি চূড়ান্ত দাম্ভিক না হও তাহলে তোমার শহরের গরীব মিসকীনদের মাঝে খাবার বিতরণ করো। অবশেষে লোকটি তার শহরের গরীব মিসকীনদের মাঝে আসা যাওয়া করতে লাগল। তাদের সাথে উঠা-বসা করতে লাগল। তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে তার মন থেকে অহংকার-দাম্ভিকতা দূর হতে লাগল। লোকটি ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে লাগল।

মায়ের স্মৃতি

রেদ্বওয়ান মাহমুদ

গভীর রাত। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। ঘড়িটা টিকটিক করে বেজে-ই যাচ্ছে। এমন সময় তো রাকিবের ঘুম ভাঙার কথা নয়। দেহটা থরথর করে কাঁপছে তার, খুব অস্থির লাগছে। কিন্তু কেন?

প্রথম চেষ্টায় কিছুই মনে করতে পারছে না সে। বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। তখন রাত ৩টা বাজে। আচমকা গলা শুকিয়ে গেছে তার! এক গ্লাস পানি পান করা যেতেই পারে। বিসমিল্লাহ বলে পানি পান শেষে কিছুটা তৃপ্তির পরশ মিলল। এমন সময় মনে পড়ল মায়ের কথা।

সে অনেক আগের গল্প। মা রাকিবকে নিয়ে একদিন স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিলেন যখনই অস্থির লাগে, এক গ্লাস পানি পান করে নিতে হয়। তাতে শান্তি পাওয়া যায়। রাকিব ক্লাস এইটের ছাত্র। পাঁচ বছর আগে তার মা পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে! মায়ের কথা মনে পড়তেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠল! চোখের সামনে ভেসে উঠল মাকে নিয়ে সাজানো হাজারো স্মৃতির অ্যালবাম। আজ মা বেঁচে নেই! ইচ্ছে করলেও 'মা' বলে ডাকা যায় না, মেলে না উত্তর।

সেদিন সূর্যটা পূর্বাকাশেই উদিত হয়েছিল, তারকারা মিটমিটি জ্বলেছিল প্রতিদিনের মতোই। তবু দিনটা অন্য রকমভাবে থেকে গেল রাকিবের জন্য! মা সেদিন সন্ধ্যা বেলা শুয়ে পড়েছিলেন। রাকিব তখন গল্পের বইয়ে মগ্ন। হঠাৎ মা ডাকলেন

-রাকিব, এদিকে আয় বাবা।

মায়ের ডাক শুনে কাছে গিয়ে বসল সে। মা তার মাথায় স্নিগ্ধ হাতের পরশ বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন- বাবা, মনে হচ্ছে আমার হাতে আর সময় বেশি নেই। মনটা কেমন যেন লাগছে! তুই মন দিয়ে লেখাপড়া করিস! ভালো মানুষ হয়ে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করিস।

মায়ের কথাগুলো সেদিন পুরোপুরি বুঝার ক্ষমতাই ছিল না রাকিবের। তবু মাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে! সেদিন রাতের বেলা মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন ! মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাবার কানে-কানে কি যেন বলেছিল! এরপরই কি যে কান্নার রোল। এর পরের স্মৃতিগুলো মনে করতে পারে না রাকিব!

পাঁচ বছর আগের এই দিনে মা বেঁচেছিলেন! মায়ের বুক ছাড়া একটা রাতও কাটাতে পারত না সে। মা ভাত মুখে তুলে না দিলে খেতেই ভুলে যেত। মাকে ছেড়ে কখনও থাকতে হবে এই কথাটা এক মুহূর্তের জন্য ভাবতে না পারলেও আজ মা ছাড়া প্রতি মুহূর্তে কষ্ট অনুভব করে সে।

গভীর রাতে মাকে দেখতে ইচ্ছে হলো রাকিবের। বুকশেলফ থেকে অ্যালবামটা বের করতেই চোখ পড়ল মায়ের মায়াভরা মুখপানে! মনের অজান্তেই দুচোখ ভেসে গেল নোনা জলে। মাকে জড়িয়ে ধরতে খুব ইচ্ছে হলো রাকিবের। একবার মা বলে ডাকতে ব্যাকুল হয়ে উঠল উদাস মন! কিন্তু, মাকে কাছে পাওয়া হলো না! মনের চাওয়া অপূর্ণই থেকে গেল। তাহাজ্জুদ শেষে জায়নামাযে বসে দরাজ কণ্ঠে ভেসে উঠল, 'রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগীরা'।

ছড়া/কবিতা

স্বাধীনতার সুখ
মাহবুবুর রহীম

স্বাধীনতার সূর্য হাসে ভোরে
খুশির দোলা পাখপাখালির সুরে।
নদীর স্রোতে মন মাতানো গানে
স্বাধীনতার সুখটা কেমন জানে।

শরৎ আকাশ মিষ্টি মধুর হাসে
ছেড়া মেঘে স্বাধীন মতো ভাসে।
কাশের বনে স্বাধীনতায় দোলে
ঘাসের জমি ভরল নানা ফুলে।

শাপলা হাসে রাঙা জলের বিলে
মাছের নাচন স্বাধীন দেশের ঝিলে।
খোকন ঘুমায় মাতৃভূমির খাটে
বাবা ছুটেন পাকা ধানের মাঠে।

মায়ের গায়ে লাল সবুজের শাড়ি
দেশটা যেন মা-বাবারই বাড়ি।
বিজয় কেতন রক্ত দিয়ে কেনা
শেষ হবে না শহীদ প্রাণের দেনা।

কৃতজ্ঞতা
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

যা দিয়েছ বেশ দিয়েছ
নেই তুলনা তার
তোমার প্রতি জানাই আমি
শোকর হাজার বার

যখন ছিলাম শোক সাগরের
অকুল দরিয়ায়
তখন আমায় উদ্ধারিলে
আপন মহিমায়

কেউ জানে না বুকের পাজর
ঝাঝরা ছিল হায়
তুমিই তখন জায়গা দিলে
আপন কিনারায়।

সেই সে মালিক আমার তুমি
রহীম রহমান
তোমার তরে শুকরিয়া তাই
থাকবে বহমান।

কর্মফল
ছাদিকুর রহমান শিবলী

কোথায় আজ বিশ্ব মোড়ল
কোথায় তোদের ত্রাস
সবার উপর নাড়ছে ছড়ি
করোনা ভাইরাস

কি দোষ ছিল ইয়ামেনবাসীর
রাজার বেটারা বল
লক্ষ লক্ষ মানুষ মারতে
করলে কতো ছল।

কমেডিয়ান রাজা বাবু
কাঁদছ কেন আজ
চোখ খুলে দেখো এবার
মহান খোদার রাজ।

সিরিয়াবাসীর কি দোষ ছিল
রে হারামির দল
লক্ষ লক্ষ বনি আদম
কেন মারলি বল।

দিল্লির আকাশ কাঁদে লাজে
কশাই দলের কাজে
মারতে মুসলিম সন্ত্রাসীরা
কত রঙে সাজে।

খোদার পাকড়াও বড় শক্ত
এবার বুঝছো ঠ্যালা
মারতে মানুষ জালিমেরা
করলে কত খেলা।

আলোর কাফেলা
(তালামীযে ইসলামিয়াকে নিবেদিত)
তানহা জনি

সত্য সঠিক পথের দিশা
কোন কাফেলা দেয় শুনি?
সুন্নাহ মতে চলতে জীবন
বীজটাও যে দেয় বুনি!

নূর নবীজির আদর্শকে
করতে লালন কে শেখায়?
দু-জাহানের চিন্তা বুকে
সুগম সে পথ কে দেখায়?

ওলীগণের ছায়ায় এসো
ঐ যে দেখো ডাকছে ভাই
বাতিলদেরই আড্ডাখানায়
ঝড়ের আভাস শুনতে পাই।

অসহায়ের দুঃখ দেখে
নয়ন বারি কে ঝরায়?
রাসূল প্রেমের ধারক ওরা
ছুটে সবার দোরগড়ায়।

শাহজালালের চেতনাকে
করতে ধারণ চায় তারা
ভয় করে না বাতিল শক্তি
কিংবা কারো পাঁয়তারা।

খুব যে ভালো ভাগ্যটা তাঁর
এই কাফেলায় যে এলো
সহীহ শুদ্ধ আকীদাতে
জীবনটাকে বদলাল।

ছাহেব কিবলার হাতেগড়া
বিপ্লবী এক মহা নাম
মুমিন হৃদে খোদাই করা
তালামীযে ইসলাম।

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. হযরত আলী (রা.) এর মাতার নাম কী?
২. VOA এর পূর্ণরূপ কী?
৩. হাদীসের ভাষায় শবে বরাতকে কী বলা হয়েছে?
৪. দালাইলুল খায়রাত গ্রন্থের লেখক কে?
৫. প্রাচ্যের রত্ন বলা হয় কোন শহরকে?

গত সংখ্যার উত্তর

১. সূরা ফাতিহা, ২. তুর্কসেল, ৩. ইমাম বুখারী (র.)
৪. তারিক বিন যিয়াদ, ৫. ১৯৮০ সালে

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মো. লোকমান আহমদ, বরমচাল হযরত খন্দকার (র.) দাখিল মাদরাসা, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **হাফিজা খাতুন**, ভরন সুলতানপুর, থানাবাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট # **মো. নাঈমুর রহমান**, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা # **তাহিয়াত মাহবুবা**, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # **রায়হান হোসেন**, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা # **সাদিয়া আক্তার ঝুমা**, মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # **জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম**, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # **ইয়াহইয়াউল ইসলাম সুজাত**, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # **তাইবা আক্তার চাঁদনী**, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # **মো. জাবেল আহমদ**, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **বদরুল ইসলাম**, নোয়াগাঁও, দনারাম, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # **হুছাম উদ্দিন মাছুম**, সাগরনাল, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **শামছুন নাহার ঝুমা**, হাজী মনোহর আলী এম.সাইফুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় # **সাইদুল ইসলাম**, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # **রোমান আহমদ**, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **সজীব মিয়া**, হাজী আজিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, টুকের বাজার, সিলেট # **তাহমিনা বেগম**, নবারুন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মোগলাবাজার, সিলেট # **মো. নাছির উদ্দিন তালহা**, দ্বীনী সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা # **আজিম উদ্দিন মাছুম**, দ্বীনী সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা # **মো. জাকারিয়া**, গাজীপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **খালেদ আহমদ**, মজিদিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা # **হাফছা আল বাছিত**, সীমান্তিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কালিগঞ্জ, জকিগঞ্জ, সিলেট # **সুলতান আল বাছিত**, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # **মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ**, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # **আশিকুর রহমান**, হাজী মাহমুদ আলী দাখিল মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **এম সাইদুল ইসলাম**, চাটেরা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # **মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী**, কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # **মো. রইছ উদ্দিন**, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # **মো. কামরুল হাসান**, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # **মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিন**, আলমদ্বীন, মঞ্জলাল, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # **হাফিয আব্দুল মুকিত**, বাঘারপাড় লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # **মো. মাহফুজ আলম জুনেদ**, বাবনিয়া হাসিমপুর নিজামিয়া আলিম মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **আবিদুর রহমান দিলু**, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **মোছা. নাজমিন বেগম**, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **মোছা. সুমা বেগম**, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # **মো. হাবিবুর রহমান বাবলু**, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # **মোছা. মাছুমা বেগম**, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # **হাফিয মো. মাহবুবুজ্জামান**, হযরত শাহজালাল (র.) দারুল কোরআন মাদরাসা, নজিপুর, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # **তারেক আহমদ রাজু**, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # **রাহিমা চৌধুরী ঊর্মি** বরমচাল স্কুল এন্ড কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # **খলিলুর রহমান**।

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি পরওয়ানার নতুন গ্রাহক হয়েছি। ফেব্রুয়ারি সংখ্যা হাতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। পরওয়ানার মাধ্যমে অনেক অজানাকে জানতে পেরেছি। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। আবাবীল ফৌজের গল্প, কবিতাসহ সবকিছুই ভালো লাগার মতো। পরওয়ানা হোক সবার জ্ঞান রাজ্যের দীপ্ত মশাল।

হাফিয আবুল খায়ের মুহাম্মদ সালেহ
গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাদ্বিল (ডিগ্রী) মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই, নতুন গ্রাহক হিসেবে তোমাকে পরওয়ানা পরিবারে স্বাগতম। আবাবীল ফৌজ তোমাদেরই বিভাগ। তোমরা লিখতে পারো যেকোনো বিভাগে। আর তোমাদের লেখার দ্বারাই এগিয়ে যাবে আবাবীল ফৌজ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, হাসতে জানি বিভাগ চালু করায় অসংখ্য ধন্যবাদ। হাসতে জানি পড়ে সত্যিই হেসেছি এবং খুব মজা পেয়েছি।

সাবিহা সুলতানা
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই, তুমি হাসতে পেরেছ শোনে আমিও একটু হেসে নিলাম। তোমাদের দাবি দাওয়া পূরণে আন্দালিব ভাই সর্বদা প্রস্তুত। আরও বিশেষ কোনো পরামর্শ লিখে পাঠাতে পারো আন্দালিব ভাই সমীপে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আমি খুব আপ্লুত। হঠাৎ জানুয়ারির প্রথম দিকে মা এনে দিলেন একটি পত্রিকা। চেয়ে দেখি নাম তার পরওয়ানা। সত্যিই আমি পরওয়ানার প্রেমিক হয়ে গেছি। আশা করি সবসময় পরওয়ানা আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে। মাআসসালাম।

ইসমাইল হোসেন তামীম
বায়তুন নূর মাদরাসা, মেরাদিয়া, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই, পরওয়ানার সাথে তোমার হৃদ্যতাকে স্বাগত জানাই। পরওয়ানাও তোমাকে সঙ্গী করে নিয়েছে। আশা করি তুমিও পরওয়ানার সাথে সেতুবন্ধন অটুট রাখবে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, পরওয়ানার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আবাবীল ফৌজের গল্পগুলো পড়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি। অনুপম আতিথেয়তা, সোনা মেয়ে, তিহামের একটি ভোর ভীষণ ভালো লেগেছে।

আহমদ শাহান তানজিম
শিক্ষার্থী, বুরাইয়া কামিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ

- **আন্দালিব ভাই,** অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় আহমদ শাহান তানজীম। আবাবীল ফৌজের গল্পগুলো তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। তুমিও চাইলে এরকম মজার মজার গল্প লিখে পাঠাতে পারো।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আবাবীল ফৌজ মাসিক পরওয়ানার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা আমাদের মতো ছোটদের অনেক আনন্দ দেয়। আমি সবসময় যত্ন সহকারে আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো পড়ি। আমাদের জন্য সবসময় এরকম ভালো কিছু উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা করি।

আব্দুল লতিফ সামি
শিক্ষার্থী, গোবিন্দগঞ্জ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই, পরওয়ানার আবাবীল ফৌজ তোমাদেরই বিভাগ। তোমাদেরকে আনন্দ দিতে পারায় আমরাও খুশি। পরওয়ানার সাথেই থাকবে, সবসময় নতুন নতুন কিছু পাবে ইনশাআল্লাহ।

শব্দ শিখি

Magazine শব্দটি এসেছে আরবি مخازن (মাখাযিন) থেকে, এক বচনে مخزن (মাখযান)। যার অর্থ ভাণ্ডার গৃহ বা গোদাম ঘর। ষোড়শ শতকে শব্দটি ইংরেজিতে প্রবেশ করে। তখন অস্ত্রাগার বা বারুদখানা অর্থে এর ব্যবহার হতো। আধুনিককালে বেতার বা টেলিভিশনে প্রচারিত বিধিধ বিষয়সংবলিত অনুষ্ঠান এবং সাময়িক পত্রিকা বুঝাতে এ শব্দের ব্যবহার হয়। কেননা ম্যাগাজিনে বিবিধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ থাকে।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম, মহান স্বাধীনতার এই মাসে তোমাদেরকে স্বাধীন সোনার বাংলার লাল সবুজের শুভেচ্ছা। যাদের অদম্য সাহস আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে এক একজন সুনাগরিক হিসেবে তোমাদেরকে গড়ে ওঠতে হবে। তোমরা যখন মেধায়-মননে গড়ে ওঠবে তখনই একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব হবে।

প্রিয় বন্ধুরা, বরকতময় শবে বরাত আমাদের খুবই নিকটে। যে রাতে মুমিন বান্দাহগণ আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। তোমাদেরকে এ রাতের বরকত অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের পাশাপাশি করোনা মহামারি থেকে বিশ্ব যেন মুক্তি পায় সে লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কায়মনোবাক্যে চাইতে হবে।

তোমাদের নতুন ক্লাসের পড়াশোনা আশা করি ভালোই চলছে। পাশাপাশি পরওয়ানা তোমাদের নিত্য সঙ্গী আছে তো? আবাবীল ফৌজে তোমাদের অংশগ্রহণে সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই ফৌজের সদস্য হয়েছ। বলতো দেখি, শব্দকল্প, বর্ণকল্পের সমাধানসহ লিখেছ আন্দালিব ভাই সমীপেও। তোমাদের এ অংশগ্রহণ যেন অব্যাহত থাকে সে প্রত্যাশা আমাদের। শুধু তোমরাই যে পরওয়ানার গ্রাহক হবে তা কিন্তু নয়। তোমাদের নতুন ক্লাসের নতুন বন্ধুদের সাথে পরওয়ানার পরিচয় করিয়ে দিয়েছ তো? তাদেরকেও আবাবীল ফৌজের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ ও লেখালেখির বিষয়ে উৎসাহ দেবে।

বন্ধুরা! তোমরা অনেকেই আবাবীল ফৌজের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছ। আমাদের কাছে অসংখ্য আবেদন জমা হয়েছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রতি সংখ্যায় সদস্য তালিকা প্রকাশ করবো ইন-শা-আল্লাহ। তোমরাও তোমাদের বন্ধুদের ফৌজের সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

তোমরা যারা লেখা পাঠিয়েছ। অনেকেই পূর্ণ ঠিকানা পাঠাওনি। যেহেতু বিজয়ীদের পুরস্কার আমরা ডাক মারফতে পাঠাব সেহেতু তোমাদের ডাকঘর ও পোস্টকোডসহ বিস্তারিত ঠিকানা লিখে পাঠাবে। তোমরা ভালো থেকো। পড়ালেখা ঠিকমতো চালিয়ে যাও। পাশাপাশি অবশ্যই শরীরের যত্ন নিতে ভুলবে না। আবাবীল ফৌজ নিয়ে যেকোনো অনুভূতি লিখে পাঠাতে পারো আন্দালিব ভাই সমীপে। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

শব্দকল্প

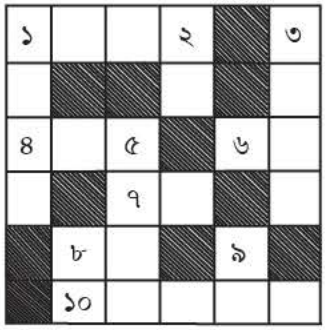

সূত্র : পাশাপাশি

১। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা ৪। বিশ্বনবীর জীবনী ৬। প্রার্থনা ৭। একটি কঠিন পদার্থ ৮। দেহ ১০। একটি বাংলা জাতীয় মাসিক

সূত্র : উপর-নীচ

১। আল কুরআনের একটি সূরা ২। পবিত্রতম শহর ৩। ধর্মগ্রন্থ ৫। অসি, তরবারি ৮। পেয়ালা এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ৯। অনুগ্রহ

গত সংখ্যার সমাধান

হা	তি		দ	ম	ন
	মি	ছি	ল		শ্ব
আ		ট		ব	র
লা	যি	ম		ন	
ম		হ		সা	জ
ত	র	ল		ই	ট

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মিফতাহ উদ্দিন মুহাম্মদ নোমান
রামপাশা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # সুমাইয়া ফেরদৌস তান্নি, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মহরম আলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

বাক্যভেদ

দুনিয়ায় এলোরে মুহাম্মদ
প্রিয় সাগর আয়রে
আয় ত্রিভুবনের বাতাস
যদি দেখবি আকাশ

এখানে একটি কালজয়ী সঙ্গীতের একটি পংক্তি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। পংক্তিটি সাজিয়ে এর গীতিকারের নামসহ পাঠিয়ে দাও।

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান

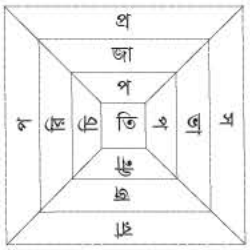

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. রেদওয়ানুল হক সোহাগ
শিক্ষার্থী, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
সোবহানীঘাট, সিলেট

বর্ণকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

মো. নাঈমুর রহমান, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাহিয়াত মাহবুবা, লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # মুদ্দাচ্ছির আল আমিন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা # ইয়াহইয়া সুজাত, গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. আবু রায়হান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মো. মহরম আলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো. রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা # আব্দুস সামাদ রাফি, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা # বদরুল ইসলাম, দনারাম, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # শাহীন আহমদ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা # হুছাম উদ্দিন মাছুম, সাগরনাল, জুড়ী, মৌলভীবাজার # শামছুন নাহার ঝুমা, হাজী মনোহর আলী এম. সাইফুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় # মোতাহির জাহান তানজিম, রঙ প্রিন্টার্স, রংমহল টাওয়ার, বন্দরবাজার, সিলেট # মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # হাফিয মো. শাহীন উদ্দিন, হযরত শাহ সদরুদ্দিন কুরেশি (র.) মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # সাইদুল ইসলাম মামুন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. রইছ উদ্দিন, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল লতিফ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. মাহফুজ আলম জুনেদ, বাবনিয়া হাসিমপুর নিজামিয়া আলিম মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সজীব মিয়া, হাজী আজিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় # তাহমিনা বেগম, নবারুন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ # রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # ওলিউর রহমান মিছবাহ, হাজী সোনাহর আলী হাফিজিয়া মাদরাসা, চাঁনপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মো. ফাহিম উদ্দিন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার # সাইদুল ইসলাম, জুড়ী সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় # মো. আব্দুল আউয়াল (সামি), হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # সুলতান আল বাছিত, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. জাকারিয়া, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. লোকমান আহমদ, বরমচাল হযরত খন্দকার (র.) দাখিল মাদরাসা, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. কাওছার আহমদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, মদিনা মার্কেট, সিলেট # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. রাশেদ আহমদ, সিলেট পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট # মো. মোজাম্মিল হোসেন, এম.সি কলেজ, সিলেট # হাফছা আল বাছিত, সীমান্তিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, কালিগঞ্জ, জকিগঞ্জ, সিলেট # হাফিজা খাতুন, ভরন সুলতানপুর, থানাবাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট # মুজাহিদুল ইসলাম হাসান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা।

আবাবীল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩০১৯. হুসাইন আহমদ রাহাত
পিতা: জমির উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সদর, সিলেট

৩০২০. সৈয়দ তোফায়েল আহমদ
পিতা: মৃত সৈয়দ নজরুল ইসলাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: নবারুন উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: মনজলাল
ডাক: বিরাহিমপুর
থানা: মোগলাবাজার
জেলা: সিলেট

৩০২১. সুমাইয়া ফেরদৌস তান্নি
পিতা: মো. আব্দুল্লাহ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সদর, সিলেট

৩০২২. আবু তাহের
পিতা: মৃত মখলিছ মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল (র.) মাদরাসা
গ্রাম: পূর্ব ফুলবাড়ী
ডাক: গোলাপগঞ্জ
ডাক: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০২৩. ইশতিয়াক আহমদ জামি
পিতা: মাওলানা ছালেহ আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সদর, সিলেট

৩০২৪. মো. রেদওয়ানুল হক সোহাগ
পিতা: আলাউদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: শৈষ্য উরা
ডাক: বেত সান্দি
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩০২৫. হামিদা মাহমুদা সুমা
পিতা: হাফিয মুজিবুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: কামালবাজার ফাযিল মাদরাসা
গ্রাম: শৈষ্য উরা
ডাক: বেত সান্দি
থানা: দক্ষিণ সুরমা
জেলা: সিলেট

৩০২৬. আহমদ হোসাইন তাহমিদ
পিতা: আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বুরাইয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: বুরাইয়া
ডাক: বুরাইয়া বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০২৭. সারোয়ার হামিদ সামু
পিতা: মো. রজব আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মানিককোনা দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: মানিককোনা
ডাক: মানিককোনা
থানা: ফেঞ্চুগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০২৮. আহমদ শাহান তানজিম
পিতা: আবুল ফজল মুহাম্মদ ত্বাহা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বুরাইয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: বুরাইয়া
ডাক: বুরাইয়া বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০২৯. আহমদ রুহান তানিম
পিতা: আবুল ফজল মুহাম্মদ ত্বাহা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বুরাইয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: বুরাইয়া
ডাক: বুরাইয়া বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

হাসতে জানি

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা তখন কাজী। একদিন বিচারে বসেছেন। ফরিয়াদি আসামির সম্পর্কে তার অভিযোগের বয়ান দিচ্ছেন। হোজ্জা মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনছেন। বাদীর বলা শেষ হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তোমার কথাই ঠিক।

এইবার আসামি বলে উঠল, হুজুর, আমার দুইটা কথা ছিল। হোজ্জা বললেন, ঠিক আছে তুমি তোমার বক্তব্য বল। আসামির বক্তব্যও মনযোগ দিয়ে শোনার পর হোজ্জা বললেন, তোমার কথাই ঠিক।

হোজ্জার স্ত্রী পর্দার আড়ালে এতক্ষণ সব কথা শুনছিলেন। বিরক্ত হয়ে স্বামীকে বললেন, দুইজনই ঠিক হয় কীভাবে? হয় আসামির কথা ঠিক অথবা ফরিয়াদির কথা ঠিক।

হোজ্জা স্ত্রীর দিকে ফিরে সমর্থনসূচক হাসি দিয়ে বললেন, বিবি তোমার কথাও ঠিক।

সংগ্রহে
এস এম মনোয়ার হোসেন
সভাপতি, ইউনিটি সোশ্যাল অর্গ্যানাইজেশন, বালাগঞ্জ, সিলেট

চিঠিপত্র

মোবাইল গেমের আসক্তি থেকে আপনার সন্তানকে বাঁচান

মোবাইল গেমের প্রতি শিশু কিশোরদের আসক্তি দিন দিন বাড়ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অনলাইন লাইভ গেমের নতুন মাত্রা। এসব গেমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ধারালো বা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বিভৎসভাবে মানুষ হত্যা করা। যা অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করে। দেশজুড়ে বাড়ছে কিশোর অপরাধ। কিশোর গ্যাং তৈরির পেছেনে রয়েছে এই সর্বনাশা মোবাইল গেমের আসক্তি।

দীর্ঘ সময় মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখ, ঘাড় ও মস্তিষ্কের ক্ষয় হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের গেমের আসক্তিকে মানসিক অসুখ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের ঘরের বাইরে না যাওয়ার বিকল্প হিসেবে তাদের হাতে মোবাইলফোন তুলে দিয়ে স্বস্তিবোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের উদাসীনতা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ অন্ধকার ডেকে আনছে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
বড়গাছ, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

জনপথে মাটি পরিবহনে অনিয়ম রোধ করুন

বাসা বাড়ি নির্মাণে মাটি ও বালুর প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণত ট্রাক দিয়ে এসব মাটি পরিবহন করা হয়। চলতি শুকনো মওসুমে বিভিন্ন স্থানে এক্ষেত্রে বেশ অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। ট্রাকের ও ভ্যানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর ইঞ্জিন চালিত ট্রলি। যা ফিটনেসের মানোত্তীর্ণ নয় এবং জনপথে চলাচলের অনুপযোগী। যে কারণে প্রাণহানির মতো দুর্ঘটনাও ঘটছে। এছাড়াও খোলাভাবে পরিবহনের কারণে মাটি পড়ছে রাস্তায়। উড়ছে ধুলোবালি। এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। এদিকে এসব মাটি পিচঢালা রাস্তায় স্তূপ আকারে থেকে যাওয়ার কারণে। এক ফোঁটা বৃষ্টি হলেই রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে চলাচলে মারাত্মক দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। তাই বর্ষা মৌসুমের আগেই রাস্তা থেকে মাটি অপসারণে পদক্ষেপ গ্রহণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইয়াহইয়া সুজাত
গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, সুনামগঞ্জ

পাঠকের প্রতি,
আপনার চারপাশের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠি লিখে chitipatra.parwana@gmail.com-এ পাঠিয়ে দিন।

—বিভাগীয় সম্পাদক